আবু ইসহাকের কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত জীবন ও তার শিল্পরূপ

হোসনে আরা

404178

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

মে ২০০৭

Dhaka University Library
404178

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, হোসনে আরা কর্তৃক উপস্থাপিত 'আবু ইসহাকের উপন্যাসে প্রতিফলিত জীবন ও তার শিল্পরূপ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

১৭.০৫.২০০৭

(ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

প্রসঙ্গকথা ৪

অবতরণিকা ৫

প্রথম অধ্যায় : কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাক ও তাঁর জীবনবোধ ৭

দ্বিতীয় অধ্যায়: আবু ইসহাকের উপন্যাস: জীবন ও তার শিল্পরূপ

প্রথম পরিচ্ছেদ: সূর্য-দীঘল বাড়ী ১৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: পদ্মার পলিদ্বীপ ৫৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: জাল ৮০

তৃতীয় অধ্যায়: আবু ইসহাকের ছোটগল্প: জীবন ও তার শিল্পরূপ

প্রথম পরিচ্ছেদ: হারেম ৯২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মহাপতঙ্গ ১০৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: স্মৃতিবিচিত্রা ১২২

উপসংহার ১২৬

গ্রন্থপঞ্জি ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

আমার এম. ফিল. অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'আবু ইসহাকের উপন্যাসে প্রতিফলিত জীবন ও তার শিল্পরূপ'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর তত্ত্বাবধানে আমি এম. ফিল. কোর্সের নিবন্ধন লাভ করি ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে এবং বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড.রফিকউল্লাহ খান ও ড.বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর নিকট এম. ফিল. প্রথম পর্বের কোর্সসমূহ অধ্যয়ন করি। বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা-প্রণয়ন ও রূপরেখা-নির্মাণে আমার গবেষণা- তত্ত্বাবধায়ক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তাঁর আন্তরিকতা,সুচিন্তিত পরামর্শ ও প্রাজ্ঞ নির্দেশনা আমার গবেষণাকর্মকে সহজসাধ্য করেছে। তাঁর কাছে আমি ঋণী।

গবেষণাকালে নানা পর্যায়ে প্রাজ্ঞ পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন আমার শিক্ষক অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন, অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল এবং অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ। বই দিয়ে সহায়তা করেছেন অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক ও মোহাম্মদ আজম। এঁদের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আন্তরিক সহযোগিতা এবং নিরন্তর উৎসাহ লাভ করেছি আমার প্রাক্তন সহকর্মী শিল্প-সমালোচক মঈনুদ্দীন খালেদ, অধ্যাপক কাজলেন্দু দে ও গল্পকার পারভীন সুলতানার কাছ থেকে।

গবেষণাকালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি ব্যবহার করেছি। এ-সূত্রে গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও বিশিষ্ট আভিধানিক আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় এক বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল নাম। নির্মোহ ও আত্মপ্রচারবিমুখ এ সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম সংখ্যায় স্বল্প, তবে বিষয়-বৈচিত্র্যে ও শিল্পস্বাতন্ত্র্যে অনন্য। শ্রমজীবী প্রান্তিক মানুষের কঠোর জীবনবাস্তবতা ও দুঃসহ জীবনসংগ্রাম তাঁর উপন্যাসে ও ছোটগল্পে শিল্পরূপ লাভ করেছে। মূলত 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের রচয়িতা হিসেবে পরিচিত হলেও, আবু ইসহাক তাঁর অপরাপর উপন্যাস ও ছোটগল্পেও শিল্পসফলতা লাভ করেছেন অনায়াস দক্ষতায়। তাঁর সাহিত্যকর্ম বিবেচনা ও মূল্যায়ন ব্যতীত বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ইতিহাস অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' ও 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাস নিয়ে বিচ্ছিন্ন কিছু লেখা প্রকাশিত হলেও, তাঁর সমগ্র কথাসাহিত্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোন গবেষণা-কর্ম, আমাদের জানামতে, সম্পন্ন হয় নি। এ বিবেচনায় তাঁর কথাসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নে বর্তমান অভিসন্দর্ভের অবতারণা।

'আবু ইসহাকের কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত জীবন ও তার শিল্পরূপ' শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভে লেখকের তিনটি উপন্যাস – 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' (১৯৫৫) , 'পদ্মার পলিদ্বীপ' (১৯৮৬), ও 'জাল' (১৯৮৯) ; দুটি গল্পগ্রন্থ – 'হারেম' (১৯৬২) ও 'মহাপতঙ্গ' (১৯৬৩) এবং একটি স্মৃতিচারণমূলক গল্পগ্রন্থ 'স্মৃতিবিচিত্রা' (২০০১) আলোচিত হয়েছে। শেষোক্ত গ্রন্থটি স্মৃতিচারণমূলক হলেও গল্পের আঙ্গিক পাওয়া যায় বেশ কয়েকটি রচনায়। তাছাড়া লেখকের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'অভিশাপ' (১৯৪০) 'স্মৃতিবিচিত্রা'য় সংকলিত হয়েছে ,এ বিবেচনায় গ্রন্থটি আলোচনায় অন্তর্ভুক্তি পেয়েছে। অন্যদিকে আবু ইসহাক রচিত একমাত্র নাটক 'জয়ধ্বনি' (২০০১) – যা বাংলাদেশ শিশু একাডেমী থেকে প্রকাশিত – কথাসাহিত্যের আলোচনায় আবশ্যিক নয় বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

বর্তমান অভিসন্দর্ভ তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। আবু ইসহাকের জীবন-পরিচিতি এবং জীবনবোধ সম্পর্কিত আলোচনা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। যেকোন লেখকের লেখায় তাঁর মূল্যবোধ, ব্যক্তিগত ভাবনার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব থাকেই – সুতরাং রচনার সর্বাঙ্গীন বিশ্লেষণের পূর্বেই রচয়িতার মানস-বিশ্লেষণ আবশ্যক বলেই বিবেচনা করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় তিনটি করে মোট ছয়টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের তিনটি পরিচ্ছেদে আবু ইসহাকের তিনটি উপন্যাসে প্রতিফলিত জীবনের রূপায়ণ এবং শিল্পরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বস্তুত, লেখকের যে মৌল প্রবণতা নিম্নবর্গের সাধারণ গ্রামীণ মানুষের জীবন-অঙ্কন , 'জাল' ব্যতীত অন্য দুটি উপন্যাসের বিষয়রূপে তাই গৃহীত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের গল্পগ্রন্থের আলোচনাতে গল্প-নির্মাণে লেখকের বিষয়-বৈচিত্র্য, চরিত্র-সৃষ্টি, রূপক বা Allegory প্রভৃতি কৌশল গ্রহণের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

শিরোনাম-সংশ্লিষ্টতা বজায় রাখার প্রয়াসে আবু ইসহাকের উপন্যাসে ও ছোটগল্পে বিধৃত জীবন-বাস্তবতার রূপ-নির্মাণের দক্ষতার প্রতিই আমাদের কেন্দ্রীয় দৃষ্টি নিবদ্ধ থেকেছে। কোন জীবনকে লেখক কীভাবে দেখেছেন বা কোন শ্রেণীর মানুষের জীবনের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব – এ সমস্ত অভিসন্দর্ভের বিশ্লেষিত বিষয়। গ্রামীণ জীবন রূপায়ণে তিনি কতখানি পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ,সময় ও সমাজ নিষ্ঠতার পরিচয় তিনি কীভাবে দিয়েছেন সে-ব্যাখ্যাও এখানে দেওয়া হয়েছে। শিল্পরূপ আলোচনায় ঔপন্যাসিকের ভাষা-বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য সফলতা-ব্যর্থতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পরিশেষে রচয়িতার সমগ্র রচনার সামগ্রিক সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে এ অভিসন্দর্ভের উপসংহারে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাক ও তাঁর জীবনবোধ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাক ও তাঁর জীবনবোধ

সাতচল্লিশোত্তর বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে আবু ইসহাক একটি বিশিষ্ট নাম। পূর্ব বাংলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবনকে নির্মোহ দৃষ্টিতে কথাসাহিত্যের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে তিনি যে শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তা অনবদ্য। সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে সাহিত্যিককে পূর্ণাঙ্গরূপে জানা অত্যাবশ্যক। সাহিত্য কেবল সমাজের দর্পণ নয়, যার চোখ দিয়ে সমাজকে দেখা হচ্ছে তার ব্যক্তিজীবন কিংবা মানসিকতার ছাপও সাহিত্যে স্পষ্ট। এ কারণে আবু ইসহাকের সাহিত্যকর্ম বিবেচনার পূর্বে তাঁর ব্যক্তিজীবন ও মননের পরিচয় জানার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাক ১৯২৬ সালের ১লা নভেম্বর (১৫ই কার্তিক ১৩৩৩) ফরিদপুর জেলার (বর্তমানে শরীয়তপুর) নড়িয়া থানার অন্তর্গত শিরঙ্গল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ইবাদুল্লাহ এবং মাতার নাম আতাহারুন্নিসা। তাদের মধ্যবিত্ত পরিবারের আয়ের উৎস ছিল কৃষি জমি এবং কাঠের ব্যবসা। তিনি ১৯৪২ সালে স্থানীয় বিঝারি-উপসী তারাপ্রসন্ন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে স্কলারশিপসহ ম্যাট্রিক , ১৯৪৪ সালে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই. এ. এবং চাকুরিরত অবস্থায় ১৯৬০ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাস করেন। আর্থিক দৈন্যের কারণে আই. এ. পাস করার পরই তাকে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়। ১৯৪৪ সালেই তিনি বেসরকারি সরবরাহ বিভাগের ইন্সপেক্টর পদে যোগদান করেন। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে নারায়ণগঞ্জ, কলকাতা ও পাবনায় চাকরি করেন। দেশবিভাগের পর নব-গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের পুলিশ বিভাগে তাঁর চাকরি হয়। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি পুলিশ ও নিরাপত্তা বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে ঢাকায় এবং ১৯৫৬ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সাব-ইন্সপেক্টর এবং সেন্ট্রাল অফিসার পদে করাচি ও ইসলামাবাদে চাকরি করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তিনি ইসলামাবাদ অবস্থান করলেও নানাভাবে বাঙালিদের সহযোগিতা করেছেন। এ কারণে তাকে চাকুরিচ্যুত করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সব পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালের ১১ই এপ্রিল সপরিবারে তিনি ইসলামাবাদ থেকে পালিয়ে কাবুল হয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং পুলিশের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পান। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত তিনি বার্মার আকিয়াবে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে ভাইস-

Dhaka University Institutional Repository

কনসাল এবং ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত কলকাতাস্থ বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে ফার্স্ট সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৪ সালে খুলনার জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের উপ-পরিচালক পদে থাকা অবস্থায় তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ২০০৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সাতাত্তর বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ছাত্রজীবনেই আবু ইসহাকের সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। ১৯৪০ সালে কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'নবযুগ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'অভিশাপ' প্রকাশিত হয়, তখন তিনি কেবল নবম শ্রেণীর ছাত্র। তারপর মাত্র একুশ বছর বয়সে রচনা করেন তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'। চাকরির ব্যস্ততা এবং অনুকূল পরিবেশের অভাবে তাঁর সাহিত্যিক জীবন যথেষ্ট মসৃণ ছিল না। সে-কারণে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাস প্রকাশের তিন দশক পর প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'পদ্মার পলিদ্বীপ (১৯৮৬)। তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মের সংখ্যা খুবই কম। দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে তাঁর তিনটি উপন্যাস – 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' (১৯৫৫), 'পদ্মার পলিদ্বীপ' (১৯৮৬), 'জাল' (১৯৮৮); দুটি গল্পগ্রন্থ –'হারেম' (১৯৬২), 'মহাপতঙ্গ' (১৯৬৩); একটি স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'স্মৃতিবিচিত্রা' (২০০১) এবং একটি নাটক 'জয়ধ্বনি (২০০১) প্রকাশিত হয়। এছাড়া গ্রন্থিত হওয়ার অপেক্ষায় তাঁর অনেক রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে।

কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাকের আরেক পরিচয় মেলে আভিধানিক হিসেবে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় ১৯৬২ সাল থেকে বাংলা বিশেষিত শব্দের নমুনা সংগ্রহ শুরু করেন তিনি এবং তাঁর সংগৃহীত শব্দাবলি নিয়ে ১৯৯৩ ও ১৯৯৮ সালে বাংলা একাডেমী 'সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান'-এর দুই খণ্ড প্রকাশ করে। পরিকল্পিত এ অভিধানের সংকলন পদ্ধতি আবু ইসহাকের নিজস্ব গবেষণাধর্মী উদ্ভাবন। 'সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান' বাংলা ভাষায় তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয়বাহী। আভিধানিক হিসেবে ১৯৯৩ সালে তিনি দুই বছরের জন্য 'মানিক মিয়া গবেষণা বৃত্তি' নামে একটি বৃত্তি পেয়েছিলেন।

সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতি হিসেবে আবু ইসহাক বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তন্মধ্যে ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮১ সালে সুন্দরবন সাহিত্য পদক, ১৯৯০ সালে লেখিকা সংঘ

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য পদক, ১৯৯০ সালে কথাশিল্পী সংসদ পুরস্কার এবং ১৯৯৭ সালে একুশে পদক উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ২০০৪ সালে তিনি রাষ্ট্র প্রদত্ত মরণোত্তর স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হন।

ব্যক্তিজীবনে ভদ্র, নম্র, মৃদুভাষী আবু ইসহাক পেশাগত জীবনেও সততা ও সত্যনিষ্ঠায় উজ্জ্বল। সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মীয় ভণ্ডামির বিরুদ্ধে আজীবন সোচ্চার এই কথাসাহিত্যিক উপন্যাস ও ছোটগল্পে তাঁর জীবনদর্শনের যথার্থ প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। কৈশোর পরবর্তী সময় থেকে শহরে অবস্থান করলেও আমৃত্যু তিনি গ্রাম-সংলগ্ন লেখক-মানস ধারণ করেছেন, গ্রামীণ জীবনাদর্শ থেকে কখনোই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত –

> শহরে বাস করলেও গ্রামের সঙ্গে আমার অন্তরের যোগ কখনো ছিন্ন হয় নি। গ্রাম আমার স্মৃতিতে বার বার এসে যায়।[১]

তাইতো তাঁর লেখায় ঘুরে ফিরেই এসেছে গ্রাম, গ্রামীণ জীবনের অন্তরঙ্গতা, সামাজিক প্রতিকূলতা, অভাব, দারিদ্র্য, কুসংস্কার প্রভৃতি।

আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেই চাকুরি নিতে হয়েছিল আবু ইসহাককে – বোঝা যায় পারিবারিক জীবনে অভাব ছিল। সুতরাং অভাবের স্বরূপ বুঝতে কষ্ট হয়নি তাঁর। তাছাড়াও সংবেদনশীল মানবিকতায় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তার চারপাশের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষ । তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যেও অধিকাংশ জায়গা জুড়ে আছে নিম্নবর্গের মানুষ। তাদের জীবন সংগ্রাম লেখক অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে অনুপুঙ্খ বর্ণনায় তুলে এনেছেন তাঁর সাহিত্যে। বাংলাদেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামজীবনের প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ , প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ আর নিরন্তর ক্ষুধার বিরুদ্ধে দরিদ্র কিন্তু অপরাজেয় মানুষের জীবনসংগ্রামের কাহিনী নির্মাণে আবু ইসহাক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

শিক্ষিত এবং উদার মানসিকতাকে লালন করে লেখক সমগ্র জীবনভর কুসংস্কার, ধর্মীয় ভণ্ডামি এবং সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করেছেন। লেখকের এ মানসিকতারও রূপায়ণ দেখা যায় তাঁর গল্প ও উপন্যাসে। মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও জীবনের ইতিবাচকতাকে ধারণ করে রচিত তাঁর গল্প-উপন্যাস মানবজীবনের সুমহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সমৃদ্ধ করেছে বাংলা কথাসাহিত্য।

Dhaka University Institutional Repository

এক সাক্ষাৎকারে[২] লেখক 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের একটি এবং 'পদ্মার পলিদ্বীপ'-এর আরও দুটি খণ্ড রচনার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন কিন্তু সময়াভাবে তা বাস্তবায়িত করতে পারেন নি। তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যে নিজ আসনকে স্থায়ী করতে সমর্থ হয়েছেন। দুঃস্থ অসহায় নর-নারীর জীবন সংগ্রামকে মানবিকতার গুণে অসাধারণ করে আবু ইসহাক আজও বেঁচে আছেন পাঠকের হৃদয়ে।

তথ্যনির্দেশ:

১.'সমসাময়িক লেখকদের চেয়ে আলাদা থাকতে চেয়েছি', আবু ইসহাকের সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন নাসির আলী মামুন, শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী ,*প্রথম আলো* , ১৬ নভেম্বর ২০০১

২.'আমার লেখালেখি প্রসঙ্গ' কথাশিল্পী আবু ইসহাকের সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার গ্রহণ আমিনুর রহমান সুলতান, *সংবাদ সাময়িকী*, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবু ইসহাকের উপন্যাস: জীবন ও তার শিল্পরূপ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূর্য-দীঘল বাড়ী

ইংরেজিতে যাকে বলে সেন (Sane) বাংলায় তাকেই ত আমরা বলতে পারি সৎ। এই সৎ শব্দটির পেছনে সদসতের কোনো নিরিখ নেই, আছে সামাজিক জীবন-যাপনের কতগুলি সভ্যরীতির চর্চার প্রতি সমর্থন। কোনো সৎ সমাজের সম্ভাবনা ও সঙ্কট নিয়ে একজন ঔপন্যাসিকের কী বলার থাকতে পারে? চ্যাপলিনে 'দি কিড' ছবিটিতে বাচ্চা জ্যাকি কুগান ঢিল মেরে মেরে জানালার কাঁচ ভাঙছে, যাতে চ্যাপলিন সেগুলো সারাতে পারে। জানালার সার্সি সারানোর পেশায় সাফল্যের ওটা ছিল চ্যাপলিনি কৌশল। একটি সম্পূর্ণ সৎ সমাজে একজন ঔপন্যাসিক ত লিখতে চান তখন, যখন শুধু জানালার সার্সি নয়, গোটা-গোটা বাড়ি বহুতল বাড়িও ঝুরঝুর ভেঙে পড়ে। যে দুঃসময়ে সময়ের গ্রন্থি ভেঙে যায়, তখনই ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস লেখার সুসময়।[১]

সমাজ বা মানব-জীবনের দুঃসময় ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস লেখার সুসময় এ কথাটির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকে যায় বটে; কিন্তু প্রকৃত অর্থে মানুষের দুঃখে সুখী নন ঔপন্যাসিকেরা বরং ভয়ংকর দুঃসময়ে মানবতার স্ফুরণ বা জীবন-সংগ্রাম অথবা দুঃসময়কে কাটিয়ে নতুন করে বাঁচার স্পৃহায় ভেঙ্গে পড়া মানুষের আবারও দৃঢ় হয়ে জেগে ওঠা – মানবজীবনের এই ইতিবাচকতাই মূলত ঔপন্যাসিকেরা তাদের উপন্যাসের ফ্রেমে ধারণ করবার চেষ্টা করেন। পরাজয় নয়, ধ্বংস নয়, ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যে সৃষ্টির সূচনা – তাই তাদের অন্বিষ্ট।

কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাক তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' (১৯৫৫) রচনা করেছেন ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের পরবর্তী জীবনসংগ্রামের কাহিনী নিয়ে। এ উপন্যাসের আলোচনায় যাবার পূর্বে সঙ্গত কারণেই এর পটভূমি অর্থাৎ ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ যা পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে খ্যাত সে-সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

১৯৪৩ সালে বাংলার জনসমাজ কেঁপে উঠেছিল মানুষের তৈরি এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আঘাতে। সে আঘাতের চিহ্ন বাংলার জনমানসে স্থায়ী হয়েছিল বেশ কয়েক দশক ধরে। জনসাধারণের স্বার্থ

Dhaka University Institutional Repository

উপেক্ষা করে ইংরেজ সরকার যখন বলপূর্বক ক্ষেতের ধান আর নৌকা দখল করে নিজেদের যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাচ্ছিল; চাল রপ্তানী করে চলেছিল; যখন জোতদার আর মজুতদারেরা সীমাহীন লাভের মোহে বিপুল পরিমাণ ধান মজুত করে চলেছিল – সে-সময় দেশে সৃষ্টি হয়েছিল এক কৃত্রিম খাদ্য সঙ্কট। ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসেও যেখানে ধান বিক্রি হয়েছিল চৌদ্দ আনা মন দরে, সেখানে মাত্র তিন মাসের মধ্যে সেই চালের দর তিন টাকা মন থেকে ছাপ্পান্ন টাকায় গিয়ে পৌঁছল। তারপরই দেখা গেল শতাব্দীর করুণতম দৃশ্য। লক্ষ লক্ষ কংকালসার মানুষ একটু খাদ্যের খোঁজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কিংবা শহরাভিমুখে যাত্রা করেছে – পথেই ঢলে পড়েছে ক্ষিধেয় এবং প্রাণবায়ু নিঃশেষ হবার আগেই তাদের দেহ ছিড়ে খেয়েছে শেয়াল, শকুনের দল। কোন কোন মহলের হিসেব মতে ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে মৃত্যুর হার দৈনিক পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়েছিল।[২] সেই নিদারুণ সময়ের বর্ণনা পাওয়া যায় ইতিহাসে, পাওয়া যায় বাংলার সংবেদনশীল লেখকদের লেখায়, চিত্রশিল্পীদের চিত্রকর্মে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের স্কেচে দুর্ভিক্ষের সেই মর্মান্তিক দৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় সাহিত্যে।

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের সূচনা হলেও এর সময়সীমা দেশবিভাগ ও তার অব্যবহিত পরবর্তীকাল। দুর্ভিক্ষের নিদারুণ তাড়নায় যারা নিরুপায় হয়ে শহরে গিয়েছিল দু'মুঠো ভাতের আশায়, তারা আবার বাঁচার প্রেরণায় ফিরে আসে গ্রামে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জয়গুনও তাদেরই একজন। দুর্ভিক্ষের বছরে বিনাদোষে তালাক-প্রাপ্তা জয়গুন দুই কন্যা ও এক পুত্র নিয়ে স্বামী-গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে নিশ্চেষ্ট ছিল কিছুকাল; কিন্তু খেতে না পেয়ে যখন তার কোলের শিশুটি মারা যায়, কাফনের অভাবে নিজের বিয়ের শাড়ির অর্ধেকটা জড়িয়ে তাকে কবরে নামিয়ে অবশিষ্ট দুই সন্তানকে বাঁচানোর তাগিদে বাধ্য হয় গ্রাম থেকে শহরে যেতে। শহরের জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যের জৌলুস তাদের চোখ ধাঁধায় কিন্তু পেট ভরায় না। লঙ্গরখানায় দু'মুঠো খাবারের আশায় দিন কাটে, নর্দমায় রাস্তার কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খাবার খেয়ে কোনমতে প্রাণধারণ করে যারা বেঁচে থাকে – একসময় তারা ফিরে আসে আবার গ্রামে –

> যারা ফিরে আসে তারা বুক ভরা আশা নিয়ে ফিরে আসে বাঁচবার। অতীতের কান্না চেপে, চোখের জল মুছে তারা আসে, কিন্তু মানুষের চেহারা নিয়ে নয়। তাদের শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে। পেট গিয়ে মিশেছে পিঠের সাথে। ধনুকের মত বাঁকা দেহ-শুষ্ক ও বিবর্ণ। তবুও তারা ভাঙা মেরুদণ্ড দিয়ে সমাজ ও সভ্যতার মেরুদণ্ড সোজা করে ধরবার চেষ্টা করে। ধুক্‌ধুকে

Dhaka University Institutional Repository

> প্রাণ নিয়ে দেশের মাটিতে প্রাণ সঞ্চার করে, শূন্য উদরে কাজ করে সকলের উদরের অন্ন যোগায়। পঞ্চাশের মন্বন্তরে হুঁচোট খাওয়া দেশ আবার টলতে টলতে দাঁড়ায় লাঠিতে ভর দিয়ে।[৩]

নতুন করে বাঁচার প্রত্যয়ে জয়গুনও দুই সন্তান সহ গাঁয়ে ফিরে আসে। 'দুর্ভিক্ষের মহাগ্রাসে' বসতভিটা ও ঘর আগেই নিশ্চিহ্ন হয়েছিল; তাই নতুন করে সে ঘর বাঁধে পৈতৃকসূত্রে-প্রাপ্ত এক 'ছাড়া ভিটে'য় 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'তে। পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী সেই পরিত্যক্ত বাড়িতে বংশলোপ পাওয়ার ভীতিকে উপেক্ষা করে,জোবেদ আলী ফকিরের তন্ত্র-মন্ত্রের উপরে ভরসায়,নিরুপায় জয়গুন নতুন করে জীবন-সংগ্রাম শুরু করে। এ বাড়ির অন্য বাসিন্দা তার ভাবী শফীর মাও একমাত্র পুত্র শফীকে নিয়ে জয়গুনের অনুগামী হয়।

পায়ের তলায় মাটি ও মাথার উপর 'রোদ-বৃষ্টি ঠেকানোর আদিম ব্যবস্থা'র জোগাড় হলে পুত্রসহ জয়গুন উদরের জ্বালা মেটাতে সামাজিক অনুশাসনের ভীতি উপেক্ষা করে বেড়িয়ে পরে জীবিকান্বেষণে। ট্রেনে করে ময়মনসিংহ থেকে সস্তায় চাল এনে গ্রামে বিক্রি করে (দুর্ভিক্ষের বছর থেকেই এক জেলার খাদ্যশস্য অন্য জেলায় আমদানি করা সরকারীভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। বস্তুত জাপানী সৈন্যরা যাতে বার্মার পর এদেশ দখল করলেও খাদ্যসংকটে ভোগে – এ কারণেই এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল এবং দুর্ভিক্ষ পরবর্তী সময়েও তা বলবৎ ছিল) এবং তার ছেলে হাসু জাহাজঘাট ও ইস্টিশনে মোট বয়ে যা আয় করে তাতে ভরপেট খাওয়া হয় না তাদের। পান্তাভাত পোড়ামরিচ দিয়ে কিংবা শুধু ভাতের ফেনই তাদের নিত্যদিনের খাবার। সামান্য লবণের খরচটাও তাদের কাছে অতিরিক্ত; দু'পয়সার পান জয়গুনের বিলাসিতার উপকরণ নয়, ক্ষুধাকে নিস্তেজ করার উপাদান হিসেবেই কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

জয়গুনের এহেন মানবেতর জীবন-যাপনও নানা প্রতিকূলতা ও বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন । গ্রাম্য-ফকির জোবেদ আলী সূর্য-দীঘল বাড়ীর চারকোণায় তাবিজ পুতে বাড়িটাকে বাসযোগ্য (!) করার দাবীতে জয়গুনের ঘনিষ্ঠতা কামনা করে। নিজেকে রক্ষা করতে জয়গুন 'চুনের ঘট' ছুড়ে তাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে – ফলে তন্ত্র-মন্ত্রের প্রহরী ছাড়াই সূর্য-দীঘল বাড়ীতে বাস করতে হয় তাদের। 'দুকানি জমি আর একখান ঘরে'র বিনিময়ে গ্রাম্য-সমাজপতি গদু-প্রধানের চার নম্বর স্ত্রী হবার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে সে – কেননা সকলের আগে তাকে ভাবতে হয় তার সন্তানদের কথা। গদু প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

তাদের আশ্রয় দেবার অঙ্গীকার করলেও তাতে বিশ্বাসস্থাপনে সায় দেয় না জয়গুনের মন। অবশ্য গ্রামের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সমাজপতিকে প্রত্যাখ্যান করার প্রতিফলও ভোগ করতে হয় তাকে। মসজিদের ইমামের মাধ্যমে জয়গুনের জীবিকার্জনের তাগিদে ময়মনসিংহ যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, নিষেধ না মানায় তার পাঠানো হাঁসের ডিম মসজিদ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয় চরম ঘৃণায় –

> মসজিদের মধ্যে কে আন্‌ল এই আন্ডা? ফিরাইয়া দ্যাও অহুনি। বেপর্দা আওরতের চীজ। ছি! ছি! ছি!– তাঁর চোখে মুখে ঘৃণার তীব্রতা ফুটে ওঠে।
>
> একজন ইঙ্গিত করে – একলা একলা সে ময়মনসিংহ যায় টেরেন কইর‍্যা। কী হিম্মত![৪]

বিত্তহীন জয়গুনের জীবন-জিজ্ঞাসা নয়, আরোপিত ধর্মীয় বিধানই প্রাধান্য পায় শ্রেণীবিভক্ত সমাজ কাঠামোয়। তাইতো জয়গুনের মেয়ে মায়মুনের বিয়ের আসরে গ্রামপ্রধানের উস্কানিতে ইমাম সাহেব জয়গুনকে বেপর্দা চলাফেরার জন্য তওবা করতে বাধ্য করেন। পরবর্তী সময়ে দ্বিগুণ বয়সী বর এবং গৃহকর্মের উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় মায়মুনকে ফিরে আসতে হয়ে মায়ের ঘরে। ইত্যবসরে করিম বক্‌শের গৃহে পালিত জয়গুনের সন্তান কাসুর অসুখে তাকে বাঁচাবার প্রয়াসে যথাসর্বস্ব বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে পড়ে জয়গুন । দুর্ভিক্ষের সময় বিনাদোষে – বলা যেতে পারে খরচ বাঁচাতে বা নিজেকে বাঁচাতে দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃত করিম বক্‌শ পরিবর্তিত মনে পুনরায় জয়গুনকে বিবাহ করতে ইচ্ছ প্রকাশ করে কিন্তু জয়গুন তাকে স্বীকৃত হয় না। আকাঙ্ক্ষিত সন্তান কাসু, হাসু ও মায়মুনকে বাঁচাবার সংগ্রামে জয়গুন তওবা ভুলে আবারও পথে নামে, মাতৃস্নেহের কাছে হার মানে ধর্মীয় অনুশাসন। জয়গুনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে লেখক স্পষ্ট করেছেন এভাবে –

> কুপির অস্পষ্ট আলোকে ছেলেমেয়েদের দিকে সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তাদের কচি মুখ জয়গুনকে তার পথের সন্ধান বাতলে দেয়, তওবার কথা সে ভুলে যায়। লালুর মা-র প্রস্তাব মাথায় নিয়ে কাল যাবে সে ধান কলে কাজ করতে। হাতে পায়ে তাকত থাকতে কেন সে না খেয়ে মরবে? ক্ষুধার অন্ন যার নাই, তার আবার কিসের পর্দা, কিসের কি? সে বুঝেছে জীবন রক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র। জীবন রক্ষা করতে ধর্মের যে কোন অপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সে প্রস্তুত। উদরের আগুন নিভাতে দোজখের আগুনে ঝাঁপ দিতেও তার ভয় নেই।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ে করতে ব্যর্থ হওয়ায় ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ গদুপ্রধান রাতের অন্ধকারে জয়গুনের ঘরের চালায় ঢিল ছুড়ে উত্যক্ত করায় গ্রামময় রটে যায় – সূর্য দীঘল বাড়ীর ভূত ক্ষেপেছে।[৬] জয়গুন ও নিজ সন্তানদের ভূতের কবল থেকে রক্ষা করতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিম বক্শ জোবেদ আলী ফকিরকে সন্তুষ্ট করে চারটি মন্ত্রপুত গজাল অমাবস্যার মধ্যরাতে সূর্য দীঘল বাড়ীর চারকোণে পুতে দেবার প্রত্যয়ে অসীম সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে আসে এবং তখনই সে আবিষ্কার করে যে অলৌকিক ভূত নয়, লৌকিক গদুপ্রধানই প্রকৃত ভূত।

> পাশ থেকে খপ করে ছায়ামূর্তির একটা হাত চেপে ধরে – গদু পরধান! তোমার এই কাম! ...!!![৭]

হাতেনাতে ধরা পড়ে নিজ অপকর্মের সাক্ষীকে বাঁচতে দেবার মানুষ নয় গদু প্রধান; অতএব, অবধারিতভাবেই পরদিন করিম বকশের মৃতদেহ পাওয়া যায় সূর্য দীঘল বাড়ীর তালগাছ তলায় এবং গ্রামময় রটে যায় – 'সূর্য দীঘল বাড়ীর ভূত তার গলাটিপে মেরেছে।'[৮]

ছেলেমেয়েদের প্রাণ-সংশয় বিবেচনায় তাদের মুখের দিকে চেয়ে আবারও পথে নামে জয়গুন, নতুন করে আরেকবার জীবনের পথে এগিয়ে যায়। বস্তুত জয়গুনের মতো মানুষদের জীবন এমনি ভাসমান তবুও জীবনস্পৃহা যে ছেদ পড়ে না, বাঁচার প্রত্যয়ে তারা যে কেবলই এগিয়ে চলে সেই ইঙ্গিত ব্যক্ত করেই ঔপন্যাসিক উপন্যাসের পরিসমাপ্তি টেনেছেন এভাবে –

> উঁচু তালগাছটা এতদূর থেকেও যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আবার তারা এগিয়ে চলে।[৯]

এ উদ্ধৃতির প্রথমাংশে ফেলে আসা ঘরের প্রতি তাদের নিরন্তর নাড়ির টান অনুভূত হয় আর শেষাংশে নিরন্তর এগিয়ে চলার আহ্বান ধ্বনিত হয়। বস্তুত এ কেবল জয়গুনের পথ চলাই নয়, এর মাধ্যমে ঔপন্যাসিক গ্রামবাংলার নিঃসম্বল নিরন্ন মানুষের জীবনকেই যেন রূপায়িত করেছেন। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এ শ্রেণীর মানুষ কেবলই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তাদের জীবন হয়ে ওঠে সংগ্রামময়; তবুও পরাজিত হয় না তারা। বেঁচে থাকার অনমনীয় প্রয়াসে জীবন-পথের যাত্রী এই মানুষেরই জীবন শিল্পিতরূপ পরিগ্রহ করেছে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে।

'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসটি রচনার শুরু ১৯৪৪-এ, আর সমাপ্তি ১৯৪৮-এর আগস্ট মাসে।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, উপন্যাসের ঘটনাকালও আনুমানিক ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮। এ উপন্যাসের সূচনা ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ পরবর্তী সময়ে গ্রাম্য-রমণী জয়গুনের গ্রামে ফেরাকে কেন্দ্র করে। এরপর তিনটি বছর কেটে যায় এবং আসে দেশবিভাগ ১৫ই আগস্ট শুক্রবার, ১৯৪৭ সাল। এর কিছুকাল পর উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। ঘটনা-পর্যালোচনায় উপন্যাসের কালপরিধি নির্ণয় সুস্পষ্ট হয়।

১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে লিখে শেষ করার পর ঔপন্যাসিক ঢাকা ও কলকাতার অনেক প্রকাশকের দ্বারে ধর্ণা দিয়েও উপন্যাসটি প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারেননি। পরবর্তীতে ১৯৫১-৫২ সালে কবি গোলাম মোস্তফার 'নওবাহার' মাসিক পত্রে উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলেও তা তেমন কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। ধারাবাহিক উপন্যাসের প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে পরবর্তী ঘটনাবলি সম্পর্কে একটা তীব্র কৌতূহল সৃষ্টি করে পাঠককে ধরে রাখার যে প্রথা প্রচলিত – তার অনুপস্থিতিই সম্ভবত পাঠক অনাগ্রহের কারণ হিসেবে কার্যকর ছিল। অবশেষে ১৯৫৫ সালে কলকাতার নবযুগ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর কলকাতা ও ঢাকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে এবং ঔপন্যাসিক হিসেবে আবু-ইসহাক স্বীকৃতি লাভ করেন।

'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে লেখক মূলত গ্রাম-বাংলার প্রান্তিক মানুষের জীবন দেশ-কাল-সমাজের প্রেক্ষাপটে সরলভাবে উন্মোচিত করেছেন। বর্ণনাধর্মী এবং বহির্বাস্তবতা প্রধান হওয়ায় এ উপন্যাসকে অনেকেই 'স্কেচধর্মী রচনা'[১১] বলে অভিহিত করেছেন বটে কিন্তু উপন্যাস সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনায় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির যৌক্তিকতা পাওয়া যায় নিঃসন্দেহে।

উপন্যাস-বিচারে ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শনের রূপায়ণ গুরুত্বসহকারে মূল্যায়িত হয়। বলা হয়ে থাকে যে, স্রষ্টার জীবনসংক্রান্ত গুরুত্ববোধ ও অভিজ্ঞতার মানসিক রূপই অখণ্ড উপন্যাসের মধ্যে প্রবাহিত হয়।[১২] আবার, এও ঠিক যে, উপন্যাস কেবল জীবন-চিত্র নয়, আঁকাড়া বাস্তবতা নয়, ইতিহাস নয় – জীবন বা বাস্তবতার শিল্পসম্মত রূপায়ণ।[১৩]

> Books are not life. They are only tremulationsons on the ether, But the novel as a tremulation can make the whole man alive tremble. Which is more than poetry, philosophy, science or any other book-tremulation can do.[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

ঔপন্যাসিক ব্যক্তিজীবনের বহুমাত্রিক সমস্যাকে সমাজ সভ্যতা ও রাষ্ট্রের পটভূমিতে বিন্যস্ত করে এককের মধ্যে বহুত্বকে প্রত্যক্ষ করেন। প্রতিকূল পরিবেশে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে জয়গুনের যে জীবন-সংগ্রাম তা তার ব্যক্তি-জীবনকেই কেবল নয়,স্বশ্রেণীর স্ব-সমাজের স্বরূপকেও উদ্ঘাটন করেছে। জয়গুনের জীবন লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই ফল। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন – ১৯৪৪ সালে তিনি সিভিল সাপ্লাইয়ের চাকুরি নিয়ে কলকাতা থেকে নারায়ণগঞ্জ যান। চাকুরিগত কারণে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা যাবার সময় ট্রেনে জয়গুনদের মতো বহু সংগ্রামী নারীকে তিনি দেখতেন – যারা জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য সামাজিক বন্ধন অগ্রাহ্য করে ময়মনসিংহ থেকে সস্তায় চাল কিনে এনে গ্রামে গ্রামে সামান্য লাভে বিক্রি করত। 'ফতুল্লা' ও 'চাষাড়া' স্টেশনে ট্রেন পৌঁছাবার আগেই চালের থলিগুলো তারা রেলরাস্তার পাশে ফেলে দিত।[১৫] এছাড়া ছিন্নমূল মানুষের ভিড়ে নারায়ণগঞ্জের স্টিমারঘাটে এবং রেলস্টেশনে হাসুর মতো অনেক নম্বরবিহীন কিশোর মুটেকে দেখেছেন। গ্রাম-বাংলার ওঝা-ফকির, তাদের চিকিৎসা-পদ্ধতি এবং গ্রামীণ মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা ও জীবন-প্রণালীও লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ। এছাড়াও লেখকের ব্যক্তিগত কথন থেকে জানা যায় যে, তাঁর মামাবাড়ির পাশে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' নামে একটি ছাড়া-ভিটে ছিল। তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে শুনেছেন যে, সে বাড়িতে মানুষ স্থায়ীভাবে বাস করতে পারে নি; যারা চেষ্টা করেছে তাদের বংশের বিনাশ ঘটেছে।

লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ প্রভৃতি ঘটনায় আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কাঠামোর পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম-বাংলার নিরন্ন মানুষের সংগ্রামী প্রয়াস শিল্পরূপ লাভ করেছে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে।

সময় ও সমাজসংলগ্নতা 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের অন্যতম অন্বিষ্ট। পঞ্চাশের দশকে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের জীবনে 'দেশবিভাগ' ও 'স্বাধীনতা'র চাইতে দুর্ভিক্ষ ও দিন-যাপনের ভীতিকর ক্লেশই প্রাধান্য পেয়েছে। সঙ্গতকারণেই 'দুর্ভিক্ষ' এ উপন্যাসে এসেছে গ্রামীণ মানুষের জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে। কাহিনীর সূচনাতেই তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের ভয়ংকর বর্ণনা থাকলেও দুর্ভিক্ষ পরবর্তী নতুন জীবনের ইঙ্গিতও সেখানে আছে – 'পঞ্চাশের মন্বন্তরে হুঁচোট-খাওয়া দেশ আবার টলতে টলতে দাঁড়ায় লাঠি ভর দিয়ে।'[১৬] বা, ' আবার তারা গ্রামে ফিরে আসে'।[১৭] পঞ্চাশের মন্বন্তর যারা কাটিয়ে উঠেছে, প্রতিনিয়ত নতুন এক দুর্ভিক্ষের আশংকায় ভীত-সন্ত্রস্তজীবন-যাপন করে তারা। চালের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে উদয় হয় 'দেইক্যো মিয়ারা, আধা মানুষ মইর‍্যা যাইব এইবার। পঞ্চাশ

Dhaka University Institutional Repository

সনের চাইয়া বড় আহাল অইবো এইবার।' [১৮] খুশীর বার্তা বয়ে নিয়ে আসে যে ঈদের চাঁদ – সেই চাঁদের আকৃতির মাঝেও নিরন্ন মানুষ ভবিষ্যৎ ভয়াবহতার ইঙ্গিত খোঁজে – "হেই আকালের বছর পঞ্চাশ সনে দক্ষিণ মুহি কাইত অইয়া ঈদের চান উঠছিল। দক্ষিণ মুহি কাইত অইয়া উঠলে আকাল অইবই।"[১৯] বস্তুত প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সাধারণ মানুষ তাদের জীবনকে জড়িয়ে নিতান্ত অসহায় জীবন-যাপন করে আসছে আবহমান কাল ধরে। আসন্ন উৎসব উদযাপনেও তাই তাদের ভয় বা প্রকৃতির ইঙ্গিতে তারা ভবিতব্যের দায় এড়াতে চায়।

উপন্যাসের শেষাংশেও নবগঠিত দেশের অভ্যুদয়ের বছরেই নতুন করে দেখা মেলে 'দৈত্যরূপী' দুর্ভিক্ষের –

> নাবিক সিন্দাবাদের ঘাড়ের ওপর এক দৈত্য চেপে বসেছিল। বাঙলা তেরোশ পঞ্চাশ সালের ঘাড়েও তেমনি চেপে বসেছিল দুর্ভিক্ষ। হাত-পা শেকলে বাঁধা পরাধীন সে বুভুক্ষু তেরোশ পঞ্চাশের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে তার পরের আরো চারটি উত্তরাধিকারীর। কিন্তু দুর্ভিক্ষ আর ঘাড় থেকে নামে নি। ঘাড় বদল করেই চলেছে একভাবে। হাত-পায়ের বন্ধনমুক্ত স্বাধীন তেরোশ' পঞ্চান্নে এসেও সে আকাল-দৈত্য তার নির্মম খেলা খেলছে। তাকে আর ঘাড় থেকে নামান যায় না।
>
> দেশে চালের দর কুড়ি টাকার নিচে নামে না বছরের কোন সময়ই। ফাল্গুন মাস থেকে সে দর আরো চড়ে যায়। চড়ে যায় লাফিয়ে লাফিয়ে। চল্লিশ টাকায় গিয়ে ঠেকে। আউশ ধান ওঠার আগে এই দর আর নামে না। ফলে যারা টেনেটুনে দু'বেলা খেত, তারা এক বেলার চালে দু'বেলা চালায়। ফেনটাও বাদ যায় না। ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে দুধ-ভাতের মত করে খায়। যারা দু'বেলা আধ-পেটা খেয়ে থাকত, এ সময়ে তারা শাক-পাতার সাথে অল্প চাল দিয়ে জাউ রেঁধে খায়। ক্ষুধিতের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যায়। পেটের জ্বালায় ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অনেকে। আশা – দশ দুয়ারে মেগে এক দুয়ারে বসে খাবে। কিন্তু দশের দশা শোচনীয়। সমস্ত দেশ দিশেহারা। দুর্ভিক্ষে কে দেয় ভিক্ষে?
>
> এ পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষ শুধু কি ভাতের? কাপড়েরও। শত কপাল কুটলেও সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্যের দ্বিগুণ দিয়েও একখানা কাপড় পাওয়া যায় না। অনেকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দেয় একই কাপড়ে।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত, সমকালীন সাহিত্যের এক বিরাট অংশজুড়েই এই দুর্ভিক্ষের ছবি আছে। বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত', শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক', শওকত ওসমানের 'জননী' কিংবা শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' প্রভৃতি উপন্যাসে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের নিদারুণ দুর্দশার চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়াও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোট গল্প 'নয়নচারা', কিংবা বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'নবান্ন'-এ দুর্ভিক্ষের মর্মস্পর্শী কাহিনী শিল্পিত হয়েছে।

হাজার বছরের প্রাচীন কবি তৎ-সমাজের অভাবের কথা বলেছেন – 'হাড়িত ভাত নাহি নিতি উপবাসী'; নিত্যদিনের উপবাস করার মত নিরন্ন মানুষ তখনও ছিল, এখনও আছে। গোলাভরা ধান আর পুকুরভরা মাছ নিয়ে যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রবচন রয়েছে তা কেবল বাংলার একাংশ মানুষের চিত্র। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে একশ্রেণীর মানুষ ঐশ্বর্যের চাকচিক্যে চিরকালই দিন কাটিয়েছে কিন্তু সমাজের বৃহত্তর শ্রমজীবী মানুষের জীবন দু'মুঠো অন্নের সংস্থানেই ব্যাপৃত থেকেছে। মধ্যযুগের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেও তাই দেবীর কাছে ঈশ্বরী পাটনীর একটাই বর প্রার্থনা – 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।' ধন নয়, মান নয়, রাজ্য কিংবা অমরত্ব নয় শ্রমজীবী নিরন্ন মানুষের নিরন্তর প্রার্থনা কেবল অন্ন অর্থাৎ ক্ষুধার নিবৃত্তি। এ প্রার্থনা সমকালীন যুগের অন্নের অভাবকেই প্রতিভাসিত করেছে, কেননা যে যুগে যে জিনিসের অভাব – যে যুগের প্রার্থিত বস্তুও তা-ই। তাছাড়া এই বাংলাদেশে বহুকাল আগে থেকেই বিশাল জনগোষ্ঠী ভূমিহীন। তাদের বাসের জন্য ভিটা আছে মাত্র,কারও বা তা-ও নেই।এই ভূমিহীন ফসলের শ্রমিক অন্যের জমিতে কাজ করে। শ্রমের তুলনায় মজুরি তাদের সামান্য। প্রচুর কৃষিশ্রমিক শুধু দুবেলা ভাত খাওয়ার বিনিময়ে উদয়াস্ত জমিনে কাজ করে। শ্রাবণ ও কার্তিকে যখন কৃষকের গোলার ফসল ফুরিয়ে আসে তখন এই শ্রমজীবী মানুষের কাজ থাকে না। অর্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটে তাদের। এভাবে ভূমিহীন মানুষ দূর অতীত থেকে মৌসুমী দুর্ভিক্ষের শিকার। তাদের যৌবন হ্রস্ব,অকালে মৃত্যুকে বরণ করতে হচ্ছে। বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠী এই ট্রাজিক ফ্রেমে বন্দি।

বস্তুত, যুগে যুগে কৃষি-নির্ভর এই বাংলার সাধারণ মানুষ যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কিংবা মানব-সৃষ্ট দুর্যোগে সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত – তাদের জীবন-ধারণ যে চিরকালই সংগ্রামমুখর – বাংলা সাহিত্য সবকালেই সেইসব প্রান্তিক মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা ধারণ করেছে; কখনও ধর্মসংগীতের আড়ালে, কখনও বা মঙ্গলকাব্যের আধারে। রূপকথা বা লোকসাহিত্যে আরও তীব্রভাবে আমরা সে-কথা পাই। গ্রামীণ রূপকথায় কোন নিরন্ন মানুষ শক্তিশালী কোন দেবতা বা দানবকে খুশি করে লাভ করে একটি হাড়ি –

Dhaka University Institutional Repository

যা সর্বদাই প্রার্থিত খাদ্যবস্তুর অঢেল সরবরাহ নিশ্চত করে। দেশে দুর্যোগ হয়ে দেখা দেয় যে মন্বন্তর ইতিহাসের পাতায় কেবল সেগুলোই লিপিবদ্ধ থাকে কিন্তু সন-তারিখ ধরে নয় প্রতিনিয়ত গ্রামীণ অভাবী মানুষ যে ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলছে, কোন রকমে উদরের জ্বালা মেটাতে যারা প্রাণপণ সংগ্রাম করছে – তাদের কথা ইতিহাসে নয়, উঠে আসে সাহিত্যে। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে অনাহারক্লিষ্ট সংগ্রামী মানুষের জীবন জয়গুনের জীবন-সংগ্রামের মাধ্যমে চমৎকারভাবে শিল্পিত হয়েছে।

দুর্ভিক্ষের পর গ্রামে ফিরে জয়গুন জনবসতি-শূন্য সূর্য-দীঘল বাড়ীতে নতুন করেই পুরোনো ক্ষুধাতুর জীবনের শুরু করে। বাড়ি বাড়ি ঘর লেপে, ধান ভেনে, চিড়া কোটে এবং উত্তর থেকে সস্তায় চাল কিনে এনে তা বিক্রি করে। তার ছেলে হাসু সারাদিন মোট বয়ে উপার্জন করে দশ বারো আনা। তা সত্ত্বেও তিনজনের তিনবেলাও পেটভরে খাবার জোটে না। পান্তাভাত, পোড়ামরিচ, শাক-পাতা ও বড়শিতে ধরা ছোট মাছ – এই তাদের নিত্যদিনের আহার্য। রান্না হয় দিনে একবার সন্ধ্যার পর, কাজ থেকে ফিরে। রাতে অর্ধেক খেয়ে সকালে পান্তাভাত – তাও পেট পুরে নয় – তাই খেয়ে কাটাতে হয় সারাটা দিন। ফেনটাও ভাগাভাগি করে খেয়ে নেয় তারা; পান্তাভাতের লবণ যোগাতেও গায়ে লাগে তাদের। ঈদ বা বিয়ের মতো উৎসবের দিনেও তাদের আহার্য অতি সামান্যই। ঈদের দিন সামান্য গুড় দিয়ে পানসে করে মিষ্টান্ন, বিয়েতে দুটো শোল মাছ ও দুটো লাউ দিয়ে তরকারী, ডাল আর দুধ – এই সামান্য খাবার উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে তাদের জীবনে। বস্তুত খাবারের রকমারিত্ব তাদের নিকট গৌণ – কোনরকমে পেট ভরানোই মুখ্য। কেবল জয়গুন নয়, তার শ্রেণীর সকল সাধারণ মানুষই উদর পূর্তি নিয়ে বিব্রত, তাদের কথাতেই তার প্রমাণ মেলে –

> মাইন্ষের প্যাট ছোড অইয়া যাউক – খোদার কাছে আরজ করি। বেবাকের প্যাডে মাজায় লাইগ্যা এক অউক। এক ছডাকের বেশি যেন খাইতে না অয়।...মাইন্ষের প্যাটটা না থাকলে আমি খুশি অইতাম। প্যাডের জ্বালাই বড় জ্বালা মাইন্ষের।[২১]

গ্রামীণ সাধারণ মানুষের কাছে অন্ন সম্পর্কিত ভাবনাই প্রধান। স্বাধীনতা'র মাঝে তারা কোন মহৎ আবেগ নয় – 'চাল সস্তা হবে', 'কারো কোন কষ্ট থাকবে না' এই আশাবাদই খুঁজে পায়। ভাত-কাপড় সুলভ হলে সহজতর দিন-যাপনের আশায় তারা উজ্জীবিত হয়; নতুন দেশের পতাকা উড়িয়ে জয়ধ্বনি দেয়। কোন রাজনৈতিক দর্শন তাদের মাঝে কাজ করে না; জীবনের মৌল চাহিদা অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানের ভাবনাই একমাত্র তাদের নিকট স্বাধীনতার তাৎপর্য বহন করে। স্বাধীনতার চাইতেও ক্ষুধার

Dhaka University Institutional Repository

যন্ত্রণার গুরুত্ব অধিক তাদের জীবনে। তাই স্বাধীনতার ফলভোগী যখন হয় না এসব নিরন্ন মানুষ তখন সকলই ফাঁকি বলে প্রতিভাত হয় তাদের নিকট –

> স্বাধীন যে অইল হের কোন নমুনাই যে পাইলাম না আইজও। কত আশা-ভস্‌সা আছিল। স্বাদীন অইলে ভাত কাপড় সাইয্য অইব। খাজনা মকুব অইব। কিন্তু কই? বেবাক ফাঁটকি, বেবাক ফাঁট্‌কি।[২২]

শ্রেণী-বিভক্ত বাংলার সমাজে সাতচল্লিশের স্বাধীনতা যে প্রকৃতঅর্থেই কতটা অসার – ঔপন্যাসিক তা চৌকশ ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। এই স্বাধীনতা যে শ্রমজীবী মানুষের স্বাধীনতা নয়, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সুবিধাজনক পদে অধিষ্ঠিত শ্রেণী আর নতুন রাষ্ট্রে বেনিয়া ধনিক শ্রেণীর সুবিধালাভের নব উপায় মাত্র – সাতচল্লিশ এবং তৎ-পরবর্তী বামপন্থী রাজনীতিকরা তা স্পষ্ট করেই রাজনৈতিক তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে জোরালোভাবে প্রচার করেছেন। কোন বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনলগ্ন হয়ে নয়, কেবল সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে ঔপন্যাসিক ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে সঙ্গে গণমানুষের ক্ষুধামুক্তির আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে।

'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে 'স্বাধীনতা' বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে নয়, সাধারণ মানুষের আশা ও আশাভঙ্গের সূত্র ধরেই এসেছে; তেমনি দেশবিভাগও বৃহত্তর মানবিক বিপর্যয় বা রাজনৈতিক দর্শনের আলেখ্য হিসেবে আসে নি। বস্তুত, নির্দিষ্ট কাল পরিসরে উপন্যাসের কাহিনী বিস্তৃত বলে অবধারিতভাবেই কালানুক্রমে 'দেশবিভাগ' ও 'স্বাধীনতা'-এর প্রসঙ্গ এসেছে। লেখক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুটি বিষয় বিশ্লেষণ করেন নি, যেমনটা করেছেন দুর্ভিক্ষ-প্রসঙ্গটি। এ দুটি প্রসঙ্গ উপন্যাসের চরিত্র – হাসু, জয়গুন এবং সমগোত্রীয় অন্যান্য নিরন্ন মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকেই রূপায়িত হয়েছে। তবে রমেশ ডাক্তারের প্রসঙ্গে এসে লেখক দেশবিভাগের বেদনা নিজস্ব মননে সংশ্লিষ্ট করে কিছুটা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। দেশবিভাগের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এবং তৎ-সম্পর্কিত ভীতি সাধারণ মানুষ তথা হাসুর দৃষ্টিকোণে উপন্যাসে উঠে এসেছে এভাবে –

> ১৫ই আগস্ট শুক্রবার, ১৯৪৭ সাল। ...
>
> রাস্তায় উঠেই সে চমকে ওঠে। চারদিক থেকে চিৎকারের ধ্বনি শোনা যায়।হিন্দু-মুসলমানে কাটাকাটি শুরু হল না ত! ...
>
> গতবছর এমন দিনে মারামরি বেঁধেছিল। পনেরো দিন সে ঘরের বার হতে পারেনি। তিনদিন

Dhaka University Institutional Repository

না খেয়ে কাটাতে হয়েছে।[২৩]

সামাজিক-রাজনৈতিক যেকোনো অনুষঙ্গে পুনঃ পুনঃ 'না খেয়ে কাটানোর' প্রসঙ্গ এসেছে আলোচ্য উপন্যাসে। খেতে পাওয়া বা না-পাওয়া যাদের জীবনের একমাত্র ভাবনা ,তাদের দৃষ্টিকোণে যেকোনো বিষয়েই যে অন্নের প্রসঙ্গ আসবে তা-ই স্বাভাবিক। যদিও উপন্যাসের আরেকাংশে ঔপন্যাসিক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে দেশবিভাগজনিত দেশত্যাগের মর্মান্তিক কাহিনী বলবার চেষ্টা করেছেন –

> স্বাধীনতা অর্জনের পরে বাস্তুত্যাগের হিড়িক পড়েছে দেশে। ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের চোখে লেগেছে আলোর ধাঁধা। ডাক্তারের স্ত্রীর চোখেও তাই লেগেছে।.... কিন্তু আদম তার সংকল্পে অটল। সে জানে, নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার অর্থ স্বর্গ-ভ্রষ্ট হওয়া। ঈভ তাই নিষিদ্ধ ফলের সাজি নিয়ে ব্যর্থ হয় বারবার।[২৪]

রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সুযোগে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ ঘটিয়ে একশ্রেণীর সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী দেশত্যাগে বাধ্য করেছে বহুমানুষকে। সাতচল্লিশ-পরবর্তী দেশত্যাগ ও উদ্বাস্তু-সমস্যা ভারতীয় উপমহাদেশের এক বিকট অসমাধিত সমস্যা। দেশত্যাগের এবং দাঙ্গার কুফল মানুষ ঠিকই উপলব্ধি করেছে কিন্তু সময় ও প্রতিবেশের বিরূপতার বলি হতে হয়েছে বহলোককে। দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও ঋজু মানসিকতা নিয়ে যারা তখনও বাস্তুভিটা আঁকড়ে ধরে ছিল, কোন ভয়-ভীতি বা হুজুগে মত্ত না হয়ে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে, রমেশ ডাক্তার তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। দেশবিভাগের প্রেক্ষাপটে তাঁর উপলব্ধি অত্যন্ত মূল্যবান –

> কতগুলো পশুর প্ররোচনায় যা হয়েছিল, তা আর হবে না দেখে নিও। ভাইয়ের বুকে ছুরি বসিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না – সবাই বুঝতে পেরেছে। ভাইয়ের বুকের রক্তে যে করুণ অভিজ্ঞতা হল, হিন্দু-মুসলমানের মন থেকে তা সহজে মুছে যাবে না। আর যদি একান্ত মুছেই যায়, তবে বুঝব, তার পেছনে কাজ করেছে স্বার্থান্ধ হিংস্রতা।[২৫]

লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে এ উক্তিতে। মানুষের প্রতি বিশ্বাস লেখকের ব্যক্তিজীবনেও খুব দৃঢ়। অত্যন্ত স্বল্প-পরিসরে লেখক দেশবিভাগ ও দেশত্যাগী মানুষের দুর্দশা এবং এর পেছনে স্বার্থান্বেষী 'হিংস্রতা'র উল্লেখ করেছেন কিন্তু বিস্তৃত অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন নি। লেখকের এই

Dhaka University Institutional Repository

পরিমিতিবোধ প্রশংসার দাবী রাখে নিঃসন্দেহে। স্বাধীনতা, দেশবিভাগ, দেশত্যাগ, উদ্বাস্তু–সমস্যা প্রভৃতি বিষয় বিস্তৃতভাবে উপন্যাসে এলে হয়তো উপন্যাসের মূলসুরের বিনাশ ঘটতো,হয়তো ঔপন্যাসিকের বক্তব্য-স্রোতও কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য খুঁজে পেত না। তাই সেসব ঘটনা বিস্তৃত করেন নি লেখক – কাহিনীর সঙ্গে, চরিত্রের জীবন ও মানসে যতটুকু প্রভাব ফেলেছে – ততটুকুরই সীমিত উপস্থাপন কাহিনীর গতিকে মসৃণ রেখে সমৃদ্ধ করেছে। রমেশ ডাক্তারের উপাখ্যানকে বাহুল্য বলে মনে করেছেন অনেক সমালোচক কিন্তু গভীর অনুভবে এ উপাখ্যান গ্রাম-বাংলার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই বোধ হয়। ডাক্তার ও ডাক্তারী শাস্ত্রের প্রতি অনীহা এবং সে-কারণে ডাক্তারদের গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার ইতিহাস গ্রামীণ জীবনে দুর্লভ নয় বরং একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একে এড়িয়ে যেতে চান নি বলে অথবা দেশত্যাগী মানুষের মর্মবেদনাকে রূপায়িত করবার মানসে ঔপন্যাসিক রমেশ ডাক্তারের উপাখ্যান সৃষ্টি করেছেন বলে অনুমান করা যায়।

'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষাপটে পূর্ববঙ্গের সমাজকে রূপায়িত করা হলেও সেই সঙ্গে পূর্ববাংলার আবহমানকালের সমাজ-কাঠামো, সংস্কার, বৈষম্য, শোষণকেও উপস্থাপন করা হয়েছে। দেশবিভাগের বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে তাই চিরকালীন গ্রামবাংলাকেও খুঁজে পাওয়া যায় এ উপন্যাসে। অসহায় মানুষের জীবন-সংগ্রামে দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্য বা শোষণের চিত্র ঔপন্যাসিক চমৎকারভাবে এঁকেছেন। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে চিরকালই শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। আবহমান কাল থেকে বাংলার গ্রামীণ সমাজে একশ্রেণীর মানুষ ক্ষমতার দাপটে শাসন ও শোষণ করে বৃহত্তর সাধারণ শ্রেণীর মানুষকে। তাদের ক্ষমতার উৎস জমি, ধর্ম এবং মানুষের অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কার। তাইতো অঢেল 'জাগা-জমিনের' মালিক গদু প্রধান তিন স্ত্রী এবং চারটা ছেলের বৌ থাকা সত্ত্বেও 'দুই কানি জমিন এবং একখান ঘরে'র বিনিময়ে জয়গুনকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। জয়গুন সে-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে তাকে শায়েস্তা করবার জন্য সাহায্য নেয় গ্রাম্য ধর্মীয় নেতা অর্থাৎ ইমাম সাহেবের। বস্তুত, চিরকালই ধর্মীয় নেতারা ধর্মকে হাতিয়ার করে গ্রাম্য মহাজন-জোতদারের সহায়তায় ধর্মভীরু অসহায় মানুষদের শাসন ও শোষণ করে এসেছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু' উপন্যাসে যেমন মজিদ ও খালেক ব্যাপারীর সমঝোতা দেখা যায়; একজন ধর্মের এবং অন্যজন সম্পত্তির জোরে ক্ষমতাবান হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতায় গ্রাম্য সমাজকে বশে রাখে; তেমনি 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে গদু প্রধান ইমাম সাহেবের সহায়তায় বশ করতে চায় অবাধ্য জয়গুনকে। দরিদ্র মানুষের সবচেয়ে কমজোরের জায়গা তার পেট ;সেটা জানে বলেই পেটে-

Dhaka University Institutional Repository

ভাতে মারার জন্য ইমাম সাহেবের সহায়তায় গদু প্রধান প্রথমেই জয়গুনের উপার্জনের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে। মায়মুনার বিয়ে উপলক্ষে জয়গুনের বেপর্দা হয়ে চলাফেরা করার জন্য তওবা করতে হয় তাকে, নতুবা বিয়ে পড়ানো হবে না বলে হুমকি দেয় গদু প্রধান। বাধ্য করে জয়গুনকে তওবা করে ঘরে বসে উপোস করতে, তাকে কমজোর করতে। তাতেও যখন কাজ হয় না তখন গদু-প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে গ্রাম্য-কুসংস্কারকে, রাতের অন্ধকারে ঘরের চালায় ঢিল ছুড়ে লোক-বিশ্বাসকে প্রবল করে 'সূর্য-দীঘল বাড়ীর ভূত ক্ষেপেছে। ' এবং বাধ্য করে তাদের গ্রামছাড়া করতে।

জয়গুনদের জীবন সংগ্রামে কেবল গদু প্রধান নয় শোষক চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয় প্ল্যাটফর্মের রেল পুলিশও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন প্রবর্তিত আইন মোতাবেক এক জেলার চাল অন্য জেলায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। জয়গুন ও তার সঙ্গীরা যখন ময়মনসিংহ থেকে চাল কিনে আনে তখন রেল-পুলিশ আইনের ভয় দেখিয়ে এই স্বল্প আয়ের নারীদের কাছ থেকেও উৎকোচ হিসেবে দু পকেট-ভর্তি চাল না নিয়ে ছাড়ে না। এভাবে সমাজের প্রতিটি স্তরে শোষণের শিকার হয় তারা।

জয়গুনের দুর্দশার পাশাপাশি অপরাপর শোষিত মানুষের চিত্রও পাওয়া যায় এ উপন্যাসে। কেবল গদু-প্রধান নয়, ফুড কমিটির সেক্রেটারী খুরশীদ মোল্লা, গ্রামের মোড়ল কাজী খলিল বক্‌শ প্রভৃতি ধনিক শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তির কালোবাজারীর চিত্রও এখানে তুলে ধরা হয়েছে । ঈদ উপলক্ষে সরকার-প্রদত্ত চিনির এক কণাও ভাগে পায় না সাধারণ মানুষেরা। রেশনের সেই চিনি দুই টাকা সেরে তাদের কিনতে হয় ফুড কমিটির সেক্রেটারী খুরশীদ মোল্লার ভাই লতিফ মোল্লার দোকান থেকে। প্রতিবাদ করার মতো কোন জোরও তাদের নেই কেননা সমাজের যারা মাথা – তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাগ পেয়ে এই কালোবাজারীকেই সমর্থন জানায়। খুরশীদ মোল্লা যখন দুঃখ-প্রকাশ করে যে সবাই তাকে 'চোর' বলে, মুহূর্তে গদু প্রধানের আস্ফালন শোনা যায় –

> -কোন্ শালা কয়? দেইক্যা নেই তার গর্দানে কয় মাথা।[২৬]

সত্যিই তো কারো তো ঘাড়ের উপর একটা ছাড়া দুটো মাথা নেই যে তারা এর প্রতিবাদ করবে, নিজেদের প্রাপ্য জোর করে আদায় করে নেবে। তাই তো তাদের মুখ বুজে ফিরে যাওয়া। কেবল হয়তো শ্লেষ মাখানো উক্তি করা –

Dhaka University Institutional Repository

আপনেরাই ঈদ করেন। আপনেগ দিন দিছে খোদায় – ঈদ করতে দিছে।[২৭]

এর বেশি কিছু বলার বা করার ক্ষমতা তাদের নেই; কেননা এ সমাজে এদের অধীনে এদেরই প্রবর্তিত নিয়ম-কানুন মেনে তাদের বাস করতে হয় , এদের জমি চাষ করেই তাদের আহার জোটে, এদের কাছে তাদের জীবন-জীবিকা বাধা পড়ে আছে। প্রতিবছর এদের জমির ধান কাটে তারা 'ছয়ভাগা' কিংবা 'সাতভাগা'য় – তবেই হয়তো সারা বছর একবেলা অন্ন জোটে সুতরাং প্রতিবাদী হবার মতো অবস্থান তাদের নয়। তাদের এই নীরবতাই এদের স্পর্ধা আরও বাড়িয়ে দেয়। সাধারণ মানুষ যখন চালের দাম বাড়া নিয়ে উদ্বিগ্ন তখন গদু প্রধানের কামনা – 'চালের দর চড়ুক।'[২৮] 'ম্যাজিস্টর' সাহেব যখন বাজারে ঢোল দেয় যে 'নয় আনার বেশী এক সেরের দাম নিলে জরিমানা অইব'[২৯] ,তখন বাজারে আর চাল খুঁজে পাওয়া যায় না, মহাজনেরা গোলায় চাল লুকিয়ে ফেলে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে; নিরুপায় মানুষকে 'বারো ছটাক বারো আনা' দরে চাল কিনতে হয়। মহাজন-জোতদার-জমিদার শ্রেণীর সামাজিক শোষণ এবং নিরুপায় কৃষিজীবী শ্রমজীবী মানুষের অসহায়ত্ব অর্থাৎ সমাজবাস্তবতাকে ঔপন্যাসিক চমৎকারভাবে রূপায়িত করেছেন।

শ্রমবিভক্ত সমাজে যেমন শ্রমজীবী মানুষের শোষণের চিত্র পাওয়া যায়, তেমনি পুরুষ-শাসিত সমাজের পটভূমিতে পাওয়া যায় নারী নির্যাতনের চিত্র। নারী একদিকে যেমন সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তেমনি ঘরের পুরুষ দ্বারা নির্যাতিত, নিপীড়িত। পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর অসহায়ত্ব-অনিশ্চয়ত্বের চিত্র মূর্ত হয়েছে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে বিভিন্নভাবে। এ উপন্যাসে বর্ণিত সমাজে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রথার উল্লেখ আছে। কথায় কথায় বা 'বিনাদোষে তালাক' দেয় করিম বক্শ, মায়মুনকে স্বামী-গৃহ থেকে বিতাড়িত করা হয় অল্পবয়স এবং কর্মে অপটু হবার কারণে। জয়গুনকে তালাক দিয়ে দুই কন্যাসহ বাড়ি থেকে বিতাড়িত করলেও তিন বছরের পুত্র-সন্তান কাসুকে রেখে দেয় করিম বক্শ সমাজের এই নীতি নির্দেশে –

পুত্র সে হাতের লাঠি বংশের চেরাগ।

কন্যা সে মাথার বোঝা কুলে দেয় দাগ।[৩০]

ক্ষুধার যন্ত্রণায় এক কন্যার মৃত্যু ঘটলে বা নিজ কন্যার বিবাহে কেবল বাপ হিসেবে উপস্থিত থাকার আহ্বান এলেও তা সহজে উপেক্ষা করতে পারে করিম বক্শ – কেননা এ সমাজে কন্যা সন্তানের প্রতি কোন মমতা তথা নারীর প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মান অবশিষ্ট নেই। নারীরা এ সমাজে কেবল উপকরণ

Dhaka University Institutional Repository

বা সন্তান লাভের উপায় বলে বিবেচিত। জয়গুনের 'গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা-কাচ্চা পেড়ে ধরনের বয়স' আছে, এবং শরীরটাও শক্ত-সমর্থ বলেই না গদু প্রধান তার চতুর্থ বিবি হবার প্রস্তাব দেয় তাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ধনী-গৃহে একাধিক স্ত্রী রাখার বিধান কেবল জৈবিক কামনা-বাসনার প্রকাশই নয়, এক ধরনের সুযোগ-সন্ধানী কৌশলও বটে। ধনী অর্থাৎ অঢেল জমির মালিকের গৃহে কাজ করবার লোক দরকার প্রচুর। কৃষিজীবী ব্যবস্থায় কৃষিজাত পণ্য বিশেষত ধান প্রাপ্তিতে ক্ষেতে যেমন পুরুষেরা পরিশ্রম করে, তেমনি কাটার পর তা মাড়াই করা, সেদ্ধ করা, ঢেঁকি ভানা এবং চাল ঝেড়ে ব্যবহার উপযোগী করা – সমস্ত প্রক্রিয়া নারীদের কর্মকাণ্ড বলে বিবেচিত;অতএব ধনী গৃহস্থের বহুবিবাহ তার আর্থিক স্বচ্ছলতার একটি উপকরণমাত্র। এ প্রসঙ্গটি উপন্যাসে ঈঙ্গিতবহ হয়ে এসেছে জয়গুনের নিকট গদু প্রধানের বিবাহ প্রস্তাব ব্যাখানে শফির মার উক্তিতে –

> দশ মরাই ধান পায় বচ্ছরে। জাগা-জমিনের হিসাব কিতাব নাই। কাম আছে মানি। তয় আমি কই, যেইখানে কাম আছে হেইখানে ভাতও আছে। আর তোর ত একলা কাম করতে অইব না। আগের তিনডা জননা আছে পরধানের। চাইড্যা পোলার বৌ আছে।[৩১]

গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক হলেও স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জনের স্বাধীনতা নেই। জয়গুনকে বারবার সমাজের নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে হয়েছে, ধর্মীয় বিধি নিষেধ আরোপিত হয়েছে কেবলই কি 'বেপর্দা' হয়ে চলাফেরার জন্য? স্বাধীন-ভাবে অর্থোপার্জন করে সে যে কোনো পুরুষের সাহায্য ছাড়াই জীবন-যাপন করছে – এ ভাবনা কি ক্রিয়াশীল ছিল না সমাজপতিদের মনে? অর্থোপার্জনের মাধ্যমে নারীরা যে ক্রমেই স্বকীয়তা অর্জন করবে এবং তাতে স্বার্থহানি ঘটবে পুরুষ-সমাজের – এ আশংকা কি জাগে নি তাদের মনে? এ প্রশ্নের উত্তর আপাতদৃষ্টিতে উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ধর্মীয় বিধি-নিষেধের যৌক্তিকতা বা উদ্দেশ্য অনুসন্ধানে এ ধরনের উত্তরই অনুমেয় হয়।

'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে নারীর সামাজিক অবস্থান চিত্রণের প্রত্যক্ষ দলিল হিসেবে শারীরিক নির্যাতনের কাহিনীও আছে। করিম বক্শ তার প্রথম স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা মেহেরনকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছিল রাত-দুপুরে যাত্রাগান শুনে আসা স্বামীকে 'দরজা খুলে দিতে দেরি হয়েছিল' বলে। তারপর সেই হত্যাকে আত্মহত্যায় রূপ দিতে মেহেরনের 'গলায় রশি বেঁধে গাবগাছে লটকিয়ে' দিয়েছিল। 'হাজার খানেক টাকা খরচ' করে সে ঘটনাকে ধামাচাপা দিতেও কোনো অসুবিধা হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

মেহেরনের হত্যার প্রতিবাদ কেউ করে নি, নারীর সামাজিক অবস্থান এতই গৌণ। মেহেরনের এই হত্যা-কাহিনী সমাজে নারীর অবস্থানকে সুস্পষ্ট করে নিঃসন্দেহে।

প্রথম স্ত্রী হত্যার পরও করিম বক্‌শ দমে যায়নি; দ্বিতীয় স্ত্রী জয়গুনের ওপরও 'তার বাহুবলের কসরত চলে ছয় বছর।' বৈবাহিক জীবনে স্বামীর কাছ থেকে কেবল অমানবিক আচরণ ও নিষ্ঠুর প্রহার লাভ করলেও জয়গুন কোনো প্রতিবাদ করে নি, সহ্য করেছে। তার এই সহনশীলতা সে লাভ করেছে ধর্মীয় অনুশাসন ও স্বসমাজ থেকেই। আবহমান কাল থেকেই স্বামীদের এই অত্যাচার চলে আসছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুরুষশাসিত সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসন। স্ত্রী নির্যাতন ধর্মসম্মত বলে প্রচলিত এ সমাজে। নারী হয়েও জয়গুনের শাশুড়ি তার পুত্রের আচরণকে সমর্থন করে বলেছে–

> মরদ্ গনে যেই পিডে মারব, হেই পিড বিস্তে যাইব। যেই আতে, যেই পায় মারব, বেবাক বিস্তে যাইব।[৩২]

এছাড়াও ধর্মীয় নানা কাহিনী প্রচলিত আছে নির্যাতিতা স্ত্রীর বেদনার প্রশমনে। জয়গুনের শাশুড়ি 'রসূল-করিম'-এর কাহিনী শোনায়, যেখানে তিনি নিজ কন্যা ফাতিমার কাছে এক কাঠুরে বৌ-র পুণ্য বর্ণনা করেছেন; কাহিনী অনুসারে কাঠুরের বৌ " আট বিস্তের বড় বিস্তে যাইব।" কেননা সেই নারী তার গৃহে নানা ধরনের লাঠি, দা, দড়ি জুগিয়ে রেখেছে যাতে তার সামান্য ত্রুটি হলে স্বামীকে যেন কষ্ট করে দা, লাঠি খুঁজতে না হয় তাকে মারার জন্য। পুরুষ-শাসিত সমাজে পুরুষের আধিপত্য বজায় রাখতে এবং নারী-নির্যাতনের বৈধতা দানে ধর্মীয় লেবাসে এ ধরনের কাহিনী প্রচলিত আছে বহুকাল ধরে। বস্তুত নারী নির্যাতন দমনের হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে এখানে ধর্ম। জয়গুনের শাশুড়িও হয়তো এই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই জীবন কাটিয়েছে। জয়গুনের শাশুড়ি, জয়গুন এবং জয়গুনের কন্যা মায়মুন এই তিন প্রজন্মের তিন নারীর উপর নির্যাতনের কাহিনী বহু প্রজন্মের নারীর অসহায়ত্ব এবং সমাজে তাদের অবস্থানকে যেন নির্দেশ করছে।

অসীম ক্ষমতাধর অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস মানবসমাজের সুপ্রাচীন বৈশিষ্ট্য। যুক্তির পাশাপাশি মানব-মনের অযৌক্তিক ভাবনার অস্তিত্ব মনোবিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। প্রাচীনকাল থেকেই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ধারাবাহিকতায় নানান ধরনের সংস্কার বা বিধি-নিষেধ তৈরি করে জীবন-যাপনকে সুস্থিত বা নিয়মতান্ত্রিক করার প্রচেষ্টা চালায়। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতে, সমাজ-বিকাশের সুদীর্ঘ ধারাবাহিক নানা রকম সংস্কার, প্রথা এবং আইনের ভেতর

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে গড়ে উঠেছে এসব বিধি-নিষেধ।[৩৩] মানব-সত্তার শেকড়ে প্রোথিত এসব বিধি-নিষেধ কালক্রমে অজ্ঞানতার আধারে ছেয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করেছে মানুষকে, বিষিয়ে তুলেছে তাদের জীবনকে। গ্রামীণ-জীবনের এই দিকটির উপর বিশেষ আলোকসম্পাত করেছেন ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক তাঁর 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে। এ উপন্যাসের নামকরণেই তার প্রমাণ মেলে। গ্রামের বেশির ভাগ বাড়িই উত্তর-দক্ষিণ প্রসারী; পূর্ব পশ্চিমে প্রসারী বাড়ি খুবই কম। পূর্ব ও পশ্চিমে অর্থাৎ সূর্যের উদয়াস্তের দিকাভিমুখী বাড়ী হলে সকালে যেমন সূর্যের প্রখর তাপ সহ্য করতে হয়, বিকেলেও তেমনি। তাছাড়া সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালে সূর্যের কিরণ তীর্যকভাবে এসে পড়ে। সূর্যাভিমুখী হয়ে কাজ-কর্ম করা যেমন কষ্টকর তেমনি চোখের জন্যেও ক্ষতিকর। তাছাড়া আরামদায়ক আলো-বাতাস উত্তর-দক্ষিণমুখী বাড়িতেই উপভোগ্য। এ সমস্ত কারণে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী বাড়ি তৈরি করতেন না। লোকায়ত মনীষার একটি ফল এটি। বচন অনুযায়ী –

দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা,

পূর্বদ্বারী তার প্রজা

পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই,

উত্তরদ্বারীর খাজনা নাই।

ক্রমে এটি একটি নিষেধাজ্ঞা বা 'ট্যাবু' তে পরিণত হয় কিন্তু মানুষ যখন যুক্তি ছেড়ে যুক্তিহীনতার দিকে অগ্রসর হয় তখন এই 'ট্যাবু' বা লৌকিক সংস্কারই ভীতিকর কুসংস্কারে পরিণত হয়। যে-কারণে আলোচ্য উপন্যাসে সূর্য-দীঘল বাড়ীর 'ভীতিজনক' ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় এবং এ ধারণা জন্মায় যে, এ বাড়িতে বাস করলে নির্বংশ হতে হবে –

> এখানে এক সময়ে লোক বাস করত, সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা বংশ রক্ষা করতে পেরেছিল কিনা কেউ জানে না। তবুও লোকের ধারণা, সূর্য-দীঘল বাড়ীতে নিশ্চয়ই বংশ লোপ পেয়ে থাকবে। নচেৎ এরকম বিরান পড়ে থাকবে কেন?[৩৪]

তাদের এ অনুমান নির্ভর বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা। খাদেম নামক এক ব্যক্তি এ বাড়িতে বসবাস কালে তার একজোড়া ছেলে-মেয়ে পানিতে ডুবে মারা গেলে অন্ধবিশ্বাস ভূমির গভীরে তার শেকড় খুঁজে পায়। তাতে ডাল পালা গজিয়ে মহীরুহ হয়ে ওঠতে সহায়তা করে গদু

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান ও রহমত কাজী অর্থাৎ সমাজের ক্ষমতাবান কিছু মানুষ,যারা তাদের প্রত্যক্ষ অলৌকিক অভিজ্ঞতার বর্ণনে গ্রামীণ মানুষের চেতনার গভীরে ভীতি স্থাপিত করে এবং সুযোগ মতো সে ভীতিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারও করে।

অবশ্য এমন 'ট্যাবু'র সন্ধান পাওয়া যায় এ উপন্যাসে যা কুসংস্কারে পরিণত হয়নি। যেমন – 'বাচ্চা-কাচ্চার মা, রাত-বিরাতে গাছের ফল-পাতা ছিঁড়তে নেই।' এ কারণে জয়গুন নিজে না ছিঁড়ে হাসুকে রাতের বেলা কুমড়ো পাতা তুলে আনতে বলে। এই 'ট্যাবু' ক্ষতিকারক তো নয়ই বরং রাতের বেলা শ্বসনে প্রবৃত্ত বৃক্ষাদি রক্ষায় বেশ কার্যকর বটে। গ্রামীণ আরও কিছু সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়,যা 'কু' অর্থাৎ ক্ষতিকর নয়। যেমন – ভয় পেলে সোনা-রূপা ধোয়ানো পানি দিয়ে ভীত ব্যক্তিকে গোসল করানো, বড়শিতে মাছ না উঠলে বড়শি পুড়িয়ে নেয়া, মাছ ধরতে গিয়ে পৌনঃপুনিক ব্যর্থতায় পরনের কাপড় উল্টো করে পরে ভাগ্য সুপ্রসন্ন করার চেষ্টা ইত্যাদি। এ ধরনের সংস্কার, বিধি-নিষেধ অর্থাৎ 'ট্যাবু' এসব নিয়ে আবহমান কালের গ্রামীণ জীবন।

অলৌকিক অস্তিত্ব তথা ভূত-প্রেতের প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং তারা যে সকল সময়ই লোকজনের ক্ষতি করতে উন্মুখ তাতেও বিশ্বাসের কমতি নেই গ্রামের মানুষের মনে। গ্রামে বাঁশঝাড়, তেতুঁল, শিমুল ও গাবগাছ বেশি দেখা যায় – কেননা এ গাছগুলো সযত্ন পরিচর্যা ব্যতীতই জন্মে ও বৃদ্ধি পায় এবং ঝাকড়া হয়ে প্রায়শ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে তলদেশ। এ কারণে 'গ্রামের লোকের বিশ্বাস-এই গাছগুলোই ভুত-পেত্নীর আড্ডা'[৩৫] গ্রামীণ কোন মানুষই তাদের বসত বাড়িতে এ গাছগুলো লাগায় না কিন্তু দেখা যায় পাখির মাধ্যমে বাহিত বীজে না চাইতেও বাড়ির বা রাস্তার ধারে অনাহুত ভাবেই বেড়ে ওঠে এরা।

গ্রামীণ মানুষের মনোজাগতিক এই ভয়কে আরও উস্কে দিতে এক শ্রেণীর ভণ্ড ফকির সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, গ্রামীণ সমাজে যারা নিজেদের অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে দাবী করে এবং জ্বিন-ভূতকে বশীভূত করার ভেলকিবাজি দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। জীবিকার প্রয়োজনে এবং প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য এরা গ্রামবাসীর মনের ভয়কে আরো জোরদার করে। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের শুরুতেই জনৈক জোবেদ আলী ফকিরের প্রসঙ্গ এসেছে। এই ফকির অপয়া জ্বীন-ভূতের আড্ডা গুড়িয়ে দিয়ে সূর্য-দীঘল বাড়ীকে বাসযোগ্য করে দেয় চারকোণে চারটা তাবিজ পুঁতে। বিনিময়ে সে গ্রহণ করে ভিক্ষার সোয়া সের চাল, পাঁচ আনা পয়সা। অবশ্য তাতেও তার 'মন ওঠে না।' সে দাবী

Dhaka University Institutional Repository

করে একজোড়া 'বড়ড়া বাঁশ' এবং 'একটা পিতলের কলসী'। নিজের প্রয়োজনীয়তা বজায় রাখতে সে জানায় –

> বছর বছর কিন্তু পাহারা বদলাইতে অইব। যেই চাইরজন এইবার রাইখ্যা গেলাম, হেইগুলা কমজোর অইয়া যাইব সামনের বচ্ছর। বোঝতেই পার, দিনরাইত ভূত-পেত্নীর লগে যুদ্ধ করা কি সোজা কাণ্ড।"[৩৬]

ফকিরের এই দাবীর অসারতা সহজেই অনুমেয়। জয়গুনের দিকে লোভের হাত বাড়াতে গিয়ে যখন চুন-মাখানো মুখ নিয়ে এ বাড়ি ত্যাগ করতে হয় – আর সে এ বাড়ি মুখো হয় না – তার পাহারাদার ছাড়াই নির্বিঘ্নে এ বাড়িতে জয়গুনদের দিন কাটে, যদিও শফির মা সর্বদাই শঙ্কিত থাকে কিন্তু গদু প্রধানের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত কোন অলৌকিক শক্তির উপস্থিতির চিহ্ন পাওয়া যায় না।

উপন্যাসের শেষাংশে আবার জোবেদ আলী ফকিরের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। জয়গুনকে শায়েস্তা করার মানসে গদু প্রধান যখন জয়গুনের ঘরের চালায় ঢিল ছুঁড়ে ভূত-প্রেতের বিশ্বাসকে জীবন্ত করে তোলে, তখন করিম বক্‌শ 'একটা পেতলের কলসী কিনে দিয়ে এবং অনেক হাতে-পায়ে ধরে জোবেদ আলী ফকিরের রাগ মাটি' করে এবং লাভ করে মন্ত্রসিদ্ধ চারটা গজাল যা অমাবস্যার মধ্যরাতে বাড়ির চারকোণে পুঁতে বাড়িকে ভূত-মুক্ত করা যাবে। সে কাজ করতে গিয়েই গদু-প্রধানের অপকর্ম দেখে ফেলায় অপমৃত্যু ঘটে করিম বক্‌শের। সমালোচকের মতে – "করিম বক্‌শের মৃত্যু ঔপন্যাসিক পরিণামের কারণ হিসেবে দুর্বল।"[৩৭] কিন্তু ঔপন্যাসিকের যে জীবনদর্শন কুসংস্কারের স্বরূপ উদ্ঘাটন – তার সিদ্ধিতে এই পরিণাম অনুপযুক্ত নয়। বস্তুত গ্রামীণ মানুষ যে চিরকালই কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের ক্রীড়নক হয়ে অন্ধ-বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে জীবন-যাপন করে এবং এ ধারার প্রতিকূলে কোন একক ব্যক্তি যে টিকতে পারে না বরং অন্ধ-বিশ্বাসই টিকে থাকে বহাল তবিয়তে যুগ যুগান্তর ধরে – গ্রামীণ-জীবনে বিদ্যমান এ সত্যটিই ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন এ উপন্যাসে। নামকরণেই ঔপন্যাসিকের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত এবং উপন্যাসের আদি-অন্তে এ সত্য উন্মোচনে ঔপন্যাসিকের সযত্ন পরিচর্যা শিল্পরূপ লাভ করেছে।

আবহমানকাল থেকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামগুলোতে রোগে-শোকে পানি পড়া, তাবিজ পড়া প্রভৃতি ব্যবহার এবং চিকিৎসকের পরিবর্তে এক শ্রেণীর ফকিরের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবণতা প্রচলিত। এ উপন্যাসে এ ধরনের অপচিকিৎসার করুণ-মর্মান্তিক বিবরণ রয়েছে। কাসুকে ছালাবুড়ি, গোঙ্গাবুড়ির

Dhaka University Institutional Repository

মিথ্যে ভয় দেখিয়ে করিম বক্‌শ যখন তার মার বাড়ি যাওয়া থেকে নিরস্ত করে তখন শিশুমনের আতঙ্ক প্রবল হয়ে ওঠে – কাসু পড়ে কঠিন অসুখে। কাসুর অসুখকে গ্রাম্য ফকির দিদার বক্‌শ ভূতের আছড় বলে অভিহিত করে অসুস্থ কাসুর নাকের ভেতর দড়ি পোড়া ঢুকিয়ে দেয়, তার এক শাকরেদের উপর ভূতের চালান দিয়ে ভূত দূর করার মিথ্যে নাটক সাজায় এবং জ্বরাক্রান্ত কাসুকে সাত ঘাটের পানি দিয়ে গোসল করিয়ে অসুস্থতার তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দেয়। ' ডাবল নিউমোনিয়া' আক্রান্ত কাসু যখন মৃত্যুর দোরগোড়ায় তখন খবর পেয়ে জয়গুন এসে ডাক্তার ডাকিয়ে আধুনিক চিকিৎসা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে কাসুকে সুস্থ করে তোলে। কাসুর অসুস্থতা এবং জয়গুনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে তার বেঁচে ওঠা কাহিনীতে গতি এনেছে, ঘটনার মোড়ও পরিবর্তিত করেছে। উপাখ্যানটি রচনার পেছনে সামাজিক কুসংস্কার, অপচিকিৎসার বিরুদ্ধে লেখকের মনোভাব সুস্পষ্ট – লেখক যেন অপচিকিৎসার বিপরীতে আধুনিক চিকিৎসার প্রচলন এবং সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন।

সমাজসত্য – যা ঔপন্যাসিক শিল্প-উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন, কেবল তার শিল্পিত উপস্থাপনই উপন্যাস নয়। সামাজিক ঘটনা চিত্রিত হয় চরিত্রের অবলম্বনে। সুতরাং চরিত্র-সৃজনে দক্ষতার উপর উপন্যাসের সফলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। সমালোচক পিস্টলের মতে :

> মহৎ উপন্যাস যিনি রচনা করবেন তাঁর প্রথম এবং প্রধান গুণ চরিত্রচিত্রণ-সামর্থ্য। এমন চরিত্র তিনি সৃষ্টি করবেন যা পাঠকের সমগ্র সত্তাকে একেবারে আবিষ্ট, মন্ত্রমুগ্ধ, আত্ম-বিস্মৃত করে দেবে, নানা গুণান্বিত, প্রশংসার্হ বা শ্রদ্ধার্হ বলে নয়, এর মূলে হল, সতেজ, সরস, প্রাণবত্তা যাকে শ্রদ্ধা না করলেও বিশ্বাস না করে, সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে নিবিড়ভাবে অনুভব না করে উপায় নেই।[৩৮]

অবশ্য কেবল মহৎ চরিত্র সৃজন করলেই মহৎ উপন্যাস যে রচিত হবে তা নয়, ঔপন্যাসিক যে চরিত্র সৃজন করবেন সে চরিত্র তার সময় ও সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করবে। এ সম্পর্কে Alberto Moravia বলেছেন –

> This crisis in the character obviously corresponds to a similar crisis in the concept of man. Modern man can be seen as mere numerical entity within the most terriyng collectives that the human race has ever known. He can be seen as existing not for himself alone but as part of something

Dhaka University Institutional Repository

> else, of a collective feeling, idea and organism. It is very difficult to create a character out of such a man, at least in the traditional sense of the world. [৩৯]

কোনো তত্ত্বকে আশ্রয় করে সৃজনশীল সাহিত্য রচিত হলেও নতুন অভিজ্ঞতায় গভীরতর জীবন-উপলব্ধি সেই তত্ত্বের সীমাকে বাড়িয়ে দেয়,কখনো সেই সীমা উত্তীর্ণ হয়ে নতুন তত্ত্বের জন্ম হয়,আবিস্কৃত হয় জীবনের নতুন সত্য। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের চরিত্র-সৃজনে ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং জীবন দর্শনের সমন্বয়ে যে চরিত্রগুলো সৃজন করেছেন আমাদের সমাজে তারা দুর্লভ নয়। বৃহত্তর গ্রামীণ সমাজে জয়গুন, শফির মা, মায়মুন, হাসু, গদু প্রধান – এদের দেখা মেলে সহজেই অর্থাৎ এ চরিত্রগুলো কেবল উপন্যাসের ফ্রেমেই সীমাবদ্ধ থাকে নি; সরস ও জীবন্ত হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে স্বকাল ও স্ব-সমাজকে।

জয়গুনের গ্রামে ফেরার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সূচনা, গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি এবং মধ্যবর্তী সময়ে তার বেঁচে থাকার সংগ্রামই এ উপন্যাসের উপজীব্য। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে মূলত জয়গুনকে কেন্দ্র করেই ঔপন্যাসিক বৃহত্তর সমাজ-বাস্তবতা বয়নে ব্রতী হয়েছেন। একদিকে দেশবিভাগের মত সাম্প্রতিক ঘটনা, অন্যদিকে চিরায়ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম, বৈষম্য ও শোষণে জারিত রক্ষণশীল গ্রামীণ-সমাজ। এই দুই কাল পরিসরে সচল জয়গুন সত্তা শোষিত-নির্যাতিত হলেও আত্মসচেতনাতে বিশেষভাবে উজ্জ্বল। জয়গুন নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর এক অসহায় নারী। 'পান্তাভাত', 'পোড়ামরিচ' তাদের নিত্যদিনের আহার্য এবং এ খাবারটুকু জোগাতেই নিম্নবর্গীয় মানুষের মতো তার পথচলা। জয়গুন এবং তার সমগোত্রীয় মানুষের জীবন সম্পর্কে একজন সমালোচক লিখেছেন –

> জয়গুনরা যে জীবন যাপন করে, তাকে মানুষের জীবন যাপন বলে স্বীকার করতে আমি রাজি নই – এমন কি তাকে গৃহপালিত পশুস্তরের জীবন বলে মেনে নেওয়াও শক্ত।[৪০]

এ মূল্যায়ন অতিরঞ্জিত নয়, বাস্তব; কিন্তু এও সত্য যে এই অসহ বাস্তবতার বলয়ে বন্দী গ্রামীণ-সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। জয়গুনের যে জীবন-যাপনের চিত্র ঔপন্যাসিক এঁকেছেন তা নিম্নবর্গীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবন। একজন নারী হিসেবেও সামাজিক নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার জয়গুন। সমালোচকের মতে –

Dhaka University Institutional Repository

> স্বামী-পরিত্যক্ত নিঃস্ব জয়গুন পূর্ববঙ্গের গ্রামের অসংখ্য দরিদ্র নারীর প্রতিনিধি, যারা দৈনন্দিন জীবনের টানা-হ্যাঁচড়ায় ক্লান্ত, বিপন্ন। সামাজিক নির্যাতন-অস্বীকৃতির মধ্যে তার অস্তিত্বের সামান্যতম মূল্য কোথায়ও গ্রাহ্য হয় নি। বাংলাদেশের উপন্যাসেই প্রথম তারা পেল সাহিত্যিক স্বীকৃতি। আবু ইসহাকের উপন্যাসে জয়গুনের গুরুত্ব এতটাই যে, পুরো সমাজের বিশ্লেষণ চলেছে তাকে কেন্দ্র করে।[৪১]

জীবিকার তাগিদে 'বেপর্দা' হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে জয়গুনকে সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। স্বামী-পরিত্যক্তা জয়গুনের দিকে লোভের হাত বাড়িয়েছে জোবেদ ফকির থেকে গ্রাম্য সমাজপতি গদু প্রধান পর্যন্ত। সমস্ত প্রতিকূলতা ঠেলে স্রোতের বিপরীতে পথ চলেছে জয়গুন – তবুও হার মানে নি। আত্মজার বিয়েতে সাময়িকভাবে তওবা করে কিছুদিন নিষ্ক্রিয় থাকলেও সন্তানদের বাঁচানোর তাগিদে আবারও আত্মপ্রত্যয়ী জয়গুন জীবিকার সন্ধানে পথে নেমেছে। জয়গুন দৃঢ়তা, প্রত্যয় এবং বিদ্রোহী চেতনার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু' উপন্যাসের জমিলা, শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বউ' উপন্যাসের নবীতুন চরিত্রের মাঝে যে দৃঢ়তা এবং বিদ্রোহী চেতনা প্রকাশিত 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র জয়গুন সেই বিদ্রোহেরই প্রতীক হয়ে উঠেছে।

জীবন-ধারণের অমিত প্রত্যয়ে জয়গুন সমগ্র সমাজের বিপরীতে অবস্থান করেছে। বারবার ভেঙেছে ধর্মীয় তথা সামাজিক নিয়ম, প্রতিপক্ষ করে তুলেছে সমাজকে, মিত্র তার কেউ নেই – কোন অবলম্বন ছাড়াই মুখোমুখি হয়ে সংগ্রাম করেছে সে সমাজের মোড়লদের সঙ্গে। সমালোচকের মতে,"নিজের স্বাধীন সত্তার বিকাশে ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে অন্তরের শক্তি ছাড়া জয়গুনের আর কোন অবলম্বন নেই।"[৪২] এই 'অন্তরের শক্তি'র স্বরূপ কী? কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির বলে বলীয়ান হয়েছে জয়গুন? – নিঃসন্দেহে মাতৃত্ব। জয়গুনের সকল শক্তি, সকল বৈশিষ্ট্যের উৎস তার মাতৃত্ব। তাকে যতই বিদ্রোহী বা সংগ্রামশীলতার প্রতীকে প্রতীকায়িত করা হোক না কেন তার বিদ্রোহ বা সংগ্রাম মাতৃত্ব থেকেই উৎসরিত। জয়গুনকে বলা যেতে পারে মাতৃত্বের Archetype .

'Racial Memory' বা 'Primitive Form' যেভাবেই অভিহিত করা হোক না কেন জয়গুনের মাতৃত্ব চিরায়ত মাতৃত্ব। মানব সভ্যতার সূচনা থেকে 'মাতৃত্ব' ধারণাটি যেভাবে বিকশিত, বিশ্লেষিত, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে,সে-বিবেচনায় জয়গুনকে মাতৃত্বের Archetype অভিধায় অভিহিত করা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। জয়গুনের মাতৃমূর্তিকে সমকালীন সাহিত্যের বিভিন্ন মহৎ চরিত্র তো বটেই বিশ্বসাহিত্যের

Dhaka University Institutional Repository

কিছু শক্তিশালী চরিত্রের সমলগ্ন বিবেচনা করাও অতিরঞ্জিত মনে হয় না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র সর্বজয়া, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী' উপন্যাসের শ্যামা, শওকত ওসমানের 'জননী'-র দরিয়া বিবি, ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসের মা কিংবা জন স্টাইনব্যাকের ' দ্য গ্রেপস্ অভ র‍্যাথ' উপন্যাসের 'মা' যেমন শক্তি ও সাহসিকতায় সকল নির্যাতন-নিপীড়ন এবং অভাবের সঙ্গে লড়াই করেছে সন্তানকে বাঁচানোর তাগিদে, সেই একইরূপে ভিন্ন পটভূমিতে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'তে আবির্ভূত হয়েছে জয়গুন। মাতৃস্নেহের অমিয়ধারা উৎসরণে চরিত্রটি অনবদ্য।

জয়গুন একরৈখিক নয়, বিচিত্রভাবে বিকশিত এক চরিত্র। দুর্ভিক্ষ-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জয়গুন এক নয়; সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। জীবনের শুরুতে পরহেজগার স্বামী জব্বর মুনসীর প্রভাবে জয়গুনও ছিল পর্দানশীন। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্বামী করিম বক্শের গৃহে ছয় বছর কেটেছে জয়গুনের অমানবিক নির্যাতন ও লাঞ্ছনায়। কোন প্রতিবাদ করে নি সে, মুখ বুজে সব সহ্য করেছে। দুর্ভিক্ষের বছর যখন বিনাদোষে করিম বক্শ তাকে তালাক দেয়, দুই কন্যাসহ বিতাড়িত করে তাকে বাড়ি থেকে তখনও জয়গুন নিশ্চুপ থেকেছে। এমনকি দুর্ভিক্ষের শুরুতে 'দুর্নামের ভয়ে স্বামী পরিত্যক্তা জয়গুন ঘরের বের পর্যন্ত হয় নি কিন্তু যখন খেতে না পেয়ে তার কোলের মেয়েটি মারা যায় এবং মরণাপন্ন হয় তার অপর দুই সন্তান তখন লোক লজ্জা ভুলে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে জয়গুন তার সন্তানদের বাঁচানোর প্রয়াসে। তার মাতৃত্ববোধই তাকে উজ্জীবিত করেছে ঘরের বের হতে, সমাজের বিধি-নিষেধ ভুলে লড়াই করতে, ক্ষুধার অন্ন যোগাতে –

> হাসু ও মায়মুনকে নিয়ে ভেসেই চলছিল। কিন্তু নিজের চেষ্টায় অকূল পাথারে কূল সে পায়। লজ্জাশরম বিসর্জন দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে। তাকে বাঁচতে হবে, ছেলেমেয়েদেরে বাঁচাতে হবে – এই সঙ্কল্প নিয়ে আকালের সাথে পাঁচ বছর সে লড়াই করে আসছে।[৪৩]

গদু প্রধানকে বিয়ে করার লোভনীয় প্রস্তাবও সে ফিরিয়ে দিয়েছে ছেলে-মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। 'দুই কানি জমিন আর একখান ঘর' লিখে দিতে চেয়েছিল গদু প্রধান। বিত্তশালীর গৃহিণী হবার সুবাদে নিত্যদিনের খাবার যোগানোর ভাবনাও তার মিটতো। কিন্তু তার দৃঢ় উত্তর –

> পোলা মাইয়ার মোখ চাইয়া আর পারুম না, মাপ করো। পোলা আর মাইয়ার বিয়া দেইখ্যা যেন চউখ বুজতে পারি, দোয়া কইর‍্যো। [৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

তিরিশের কাছাকাছি বয়স যে নারীর – প্রৌঢ়ত্বের ছায়া এখনও যার দেহে পড়ে নি – জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত সে নারীর হতাশার সুর শোনা যায় জয়গুনের কণ্ঠে। জীবনের সকল আশা, সকল সাধ বিসর্জন দিয়ে কেবল ছেলে-মেয়ের সুখীসমৃদ্ধ জীবনই তার কাম্য। মাতৃত্বের এই শাশ্বত রূপ সকল কালে সকল সমাজে মহৎ রূপে আবির্ভূত হয়; মানব জীবনের মহিমাকে সমুন্নত করে।

ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করায় তার পাঠানো দ্রব্য মসজিদের ইমাম গ্রহণ করে নি বরং ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তাকে একঘরে করে রাখা হয়েছে। লোকোপবাদে জয়গুন বিব্রত হয় নি, সে নিষেধাজ্ঞা মানে নি বরং দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছে –

> খাইট্যা খাইমু। কেওরডা চুরি কইর‍্যাও খাই না, খ'রাত কইর‍্যাও খাই না। কউক না, যার মনে যা।[৪৫]

পরক্ষণেই তার মনে পাপবোধ জেগেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ মানুষের মতো জয়গুনও প্রকৃতপক্ষে ধর্মভীরু। বাড়ির বাইরে গিয়ে পুরুষদের মাঝ দিয়ে হেঁটে বেড়ানোয় তার যে পাপ হয়েছে সে তা বিশ্বাস করে এবং এও বিশ্বাস করে যে, এজন্য তাকে দোজখে যেতে হবে এবং কঠোর শাস্তি পেতে হবে। পুঁথি পড়ে শোনা দোজখের শাস্তির বিবরণ তার মনে অসম্ভব ভীতি জাগিয়ে তোলে বটে কিন্তু ছেলে-মেয়েকে বাঁচানোর তাগিদের কাছে পরাজিত হয় সে ভীতি। ধর্মীয় অনুশাসনের চাইতে মাতৃত্বই প্রবল হয়ে ওঠে –

> ছেলে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে মমতায় তার বুকে ভরে ওঠে। দুটি কচি মুখ। এদের বাঁচাতেই হবে। ধর্মের অনুশাসন সে ভুলে যায় এক মুহূর্তে। জীবন-ধারণের কাছে ধর্মের বারণ তুচ্ছ হয়ে যায়, মিথ্যে হয়ে যায় তার কাছে।[৪৬]

গভীর আত্মপ্রত্যয়ে ধর্মের বারণ তুচ্ছ করে সন্তানদের জীবন-রক্ষার্থে সে পথে নামে। সামাজিক সব বিরূপতা যাকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে না, সন্তানের মঙ্গলার্থে সেও একসময় নতি স্বীকার করে; মায়মুনের বিয়েতে তওবা করতে বাধ্য হয় জয়গুন। বিবাহের আসরে যখন গদু প্রধানের প্ররোচনায় জয়গুনের তওবা করার প্রস্তাব ওঠে তখন জয়গুন অসম্মতি জানায় কেননা তার ক্ষেত্রে তা করার অর্থ হল ' না খেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মরা।' লড়াই করে বাঁচতে অভ্যস্ত জয়গুন হাতপা বেঁধে ঘরে বন্ধ থেকে নিজেকে এবং সন্তানদের সুনিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে চায় নি। তাই সে স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করে –

> না, আমি তোবা করতাম না।[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

এ পরিস্থিতিতে তাকে যখন প্রলুব্ধ করা হয় যে, আজকের দিনের মতো তওবা করে নিতে, পরে না মানলেই হলো, তাতেও তার আপত্তি –

> তোবা, তো'বা-ই। একবার করলে তা আর ভাঙতে পারতাম না।[৪৮]

নিম্নবর্গের নারী হলেও ব্যক্তিত্বের ঋজুতা এবং সততা প্রকাশিত তার এ উক্তিতে। সমাজে যখন কপটতার প্রদর্শনী চলছে, রাজনৈতিক পর্যায়ের সব প্রতিশ্রুতি যখন ধুলোয় মিশেছে, ব্যক্তি-প্রতিশ্রুতির তখন কি-ই বা মূল্য থাকতে পারে? কিন্তু জয়গুনের নিকট তার প্রতিশ্রুতির মূল্য অসীম। সে কপট নয়; তাই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভাঙ্গা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মানব-মহিমার সর্বোচ্চ চূড়ায় তার অবস্থান। অবশ্য তওবা তাকে করতে হয় তার কন্যার কথা ভেবে। কেননা যে-সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা নেই সে-সমাজের লোকের সম্মিলিত অংশগ্রহণ ব্যতীত বিবাহের মতো একটি সামাজিক আচার পালন সম্ভব নয়; অথচ সমাজের চোখে সে ঘৃণিত। কেননা সমাজের লোকের ধারণা –

> পর্দা না মানলে চল্লিশ বছরের এবাদতও কবুল হয় না খোদার দরগায়। সব বরবাদ অইয়া যায়। বেপর্দা স্ত্রীলোক আর রাস্তার কুত্তী সমান।[৪৯]

তওবা করার পর অবশ্য এই 'রাস্তার কুত্তী সমান' জয়গুনের খাবার খেতে কারও আপত্তি হয় না, কেননা তওবা করার সঙ্গে সঙ্গে সে পরিশুদ্ধ বিবেচিত হয় সামাজিক দৃষ্টিতে।

নিজ প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রাখতে জয়গুন সর্বংসহা হয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করেছে কিন্তু ঘরের বের হয় নি। প্রবল ক্ষুধার যন্ত্রণা সে মুখ বুজে সহ্য করেও কাসুর অসুস্থতার সময়ে করিম বক্‌শের বাড়িতে অবস্থান কালে সে-বাড়ির অন্ন স্পর্শ করে নি। প্রবল আত্মসম্মানবোধের পরিচয় দিয়ে দিনের পর দিন সে না খেয়ে বা হাসুর এনে দেয়া খাবারের কিছু অংশ গ্রহণ করে কাটিয়েছে। পরবর্তী সময়ে বাড়ির ফলজ ও বনজ গাছ বিক্রি করে সন্তানদের মুখে খাবার দেয়ার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়েছে এবং একেবারেই নিঃস্ব হলে সন্তানদের বাঁচানোর তাগিদেই তওবার প্রতিশ্রুতির শৃঙ্খল ভেঙে পর্দার সংকীর্ণতাকে পরিত্যাগ করে উদার উন্মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে ইহকাল ও পরকালের সব ভীতিকে উপেক্ষা করে। সমাজের শাসন অতিক্রম করায় নতুন করে তার জীবনে দুর্যোগ এসেছে সত্য, কিন্তু নতি সে স্বীকার করে নি – অমানবিক, আগ্রাসী গ্রাম-সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সন্তানসহ সে আবারও যাত্রা করেছে অজানার উদ্দেশ্যে।

Dhaka University Institutional Repository

'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে আবু ইসহাক জয়গুনের সংগ্রামশীলতার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনকে চিত্রিত করেছেন। জয়গুনের নিঃস্বতার বাস্তবতাই সবচেয়ে বড় সত্য তবে জয়গুন সকল নিঃস্ব মানুষের প্রতিনিধি হয়েও লেখকের মানসকে ধারণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে। জয়গুনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় হাজারো বছরের সংস্কারমুক্তির সাহসিকতা। উপন্যাসের শুরুতেই জয়গুন সন্তানসহ বাস করতে আসে যে বাড়িতে – গ্রামের লোক কুসংস্কারজনিত ভীতিতে সে-বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার মত সাহসও সঞ্চয় করতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজনই সকল ভীতিকে উপেক্ষা করার দুঃসাহস হয়ত জুগিয়েছে বা জোবেদ আলি ফকিরের মন্ত্রপূত তাবিজ সাময়িকভাবে তাদের মনস্থির করতে সহায়তা করেছে – এ কথা সত্য, কিন্তু জয়গুন কি কেবলই ফকিরের উপর নির্ভরশীল ছিল? তা তো নয়। নয় বলেই ফকিরের লোভের হাতকে ফিরিয়ে দেবার স্পর্ধা সে দেখিয়েছে। কেবল তা-ই নয়, মনোজাগতিক সব ভীতিকে জয় করে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে 'তাবিজ' ছাড়াই সূর্য-দীঘল বাড়ির মতো ভীতিকর বাড়িতে বাস করার। আবাল্য-লালিত কুসংস্কার থেকে জয়গুনের মুক্তিকে বৃহত্তর অর্থে লেখক সকল নিঃস্ব মানুষের মনোজাগতিক সংস্কারমুক্তির প্রতীক হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ঔপন্যাসিকের আশাবাদই ব্যক্ত হয়েছে জয়গুনের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তিগত জীবনে ঔপন্যাসিক এ সব কুসংস্কারকে তার জীবনে স্থান দেন নি বরং তাঁর সব সময়ের চেষ্টা ছিল এর পেছনের হিংস্র স্বার্থান্ধ কার্য-কলাপকে খুঁজে বের করার, তাঁর স্মৃতি-কথা 'স্মৃতিবিচিত্রা'য় বর্ণিত বেশ কিছু ঘটনায় এর সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়।

দুর্ভিক্ষ-উত্তর গ্রামে ফিরে আসা জয়গুন আত্মপ্রত্যয়ী এবং সংগ্রামশীল হলেও যথেষ্ট সংস্কারাচ্ছন্ন। গ্রামের অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতোই তার মনেও অশরীরী-ভীতি জাগরিত। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের মতোই সেও ধর্মভীরু। তবুও প্রয়োজনের তাগিদে ভূত-প্রেত অথবা ধর্মের অপব্যাখ্যার অসারতা প্রতিপন্ন করেছে মনোজাগতিক আন্দোলনে। দুর্ভিক্ষের চারবছর জয়গুন রমজানের পুরো মাস রোজা রাখতে পারে নি কিন্তু এতে তার পাপ হয়েছে এ কথা মানতেও তার মন বিদ্রোহী। তার বিশ্লেষণ –

> কেন? সে-ত জীবনভর রোজা রেখেই চলেছে। রোজা ছাড়া আর কি? বারো মাসের একদিনও সে পেট ভরে খেতে পায় না। ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত আধপেটা খেয়ে থাকে। পেট ভরে কবে সে শুধু ভাত খেয়েছে তার মনে পড়ে না। পঞ্চাশ সনের কথা মনে হয়। একটা রোজাও রাখা হয় নি। রোজা রাখার কথা মনেও হয় নি। এক বাটি ফেনের জন্যে ছেলেমেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে কত জায়গায়, কত বাড়ীতে বাড়ীতে তাকে ঘুরতে হয়েছে। এক বাটি খিচুড়ির জন্যে লঙ্গরখানায় লাইন ধরতে হয়েছে। মাথার ওপর বৃষ্টি পড়েছে, রোদ জ্বলেছে। তার বেশী জ্বলেছে পেটের মধ্যে। যখন যেখানে যতটুকু পেয়েছে, খেয়েছে। পেট ভরে নি। পানি খেয়ে খেয়ে পেট ভরেছে। তার পরের বছরগুলিও চলেছে অতি কষ্টে। ছেলেমেয়েকে খাইয়ে কতদিন উপোস করতে হয়েছে। মাঝে মাঝে সারারাত সারাদিন কেটেছে একটা দানাও পড়েনি পেটে। রমজান মাসের রোজার চেয়েও যে ভয়ঙ্কর এ রোজা। রমজানের একমাস দিনের বেলা শুধু উপোস। কিন্তু তার বারোমাস রোজার যে অন্ত নেই।[৫০]

দিন যাপনের মর্মান্তিক স্মৃতিচারণে ধর্মের প্রচলিত ব্যাখ্যার অযৌক্তিকতা খুঁজে জয়গুন অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়াস পেয়েছে। তবে এ প্রত্যয় যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে নি তার মনে তখনও। বার বার তাই মনের অন্দরে হানা দিয়েছে পাপবোধ। অনেকটা নিরুপায় হয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে জীবন-যাপনে ভিন্নতা অবলম্বন করলেও শান্তি সে পায় নি। মায়মুনের বিয়েতে তওবা করতে প্রথমে অস্বীকৃতি জানালেও সমাজের চোখে 'রাস্তার কুত্তী' হয়ে সে থাকতে চায়নি – তওবা সে করেছে এবং দীর্ঘদিন তা বজায়ও রেখেছে কেবল সমাজের ভয়ে নয়; নিজের কাছে, খোদার কাছে জবাবদিহিতার ভয়েও বটে। কিন্তু একসময় ধর্মীয় সংস্কার থেকেও সে মুক্ত হতে পেরেছে। নিজে উপোস থেকেও যখন সন্তানদের মুখে একবেলা আহার যোগাতে ব্যর্থ হয়েছে ; সন্তানদের নিশ্চিত মৃত্যু প্রত্যক্ষ না করে প্রতিশ্রুত প্রায়চিত্তের বন্ধন ছিন্ন করে আবারও পথে নেমেছে নতুনবোধে উজ্জীবিত হয়ে –

> হাতে পায়ে তাকত থাকতে কেন সে না খেয়ে মরবে? ক্ষুধার অন্ন যার নেই, তার আবার কিসের পর্দা, কিসের কি? সে বুঝেছে , জীবন রক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র। জীবন রক্ষা করতে ধর্মের যে কোন অপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সে প্রস্তুত। উদরের আগুন নিবাতে দোজখের আগুনে ঝাঁপ দিতেও তার ভয় নাই।[৫১]

জীবনের প্রতিবন্ধক হিসেবে ধর্মের অবস্থান নয়, ধর্ম জীবন-যাপনের সহায়ক; অথচ প্রচলিত ধর্মীয় প্রথায় মানবতা নয়, অমানবিক নিয়ম নীতিই প্রাধান্য পায়। এই কঠোর নীতি-নির্ভর, মানবতা-বিবর্জিত ধর্মীয় অনুশাসন কতিপয় ধর্ম-ব্যবসায়ীর স্বার্থ-রক্ষার হাতিয়ার-মাত্র; কখনওই পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান নয়। বাংলাদেশের নিরক্ষর-সরল-অসহায় মানুষের ধর্মভীরুতার সুযোগে স্বার্থান্বেষী এক দল

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ যে নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো ধর্মের অপব্যখ্যায় জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে, তার চিত্র সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র 'লালসালু' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে এসেছে। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় জয়গুনের জীবন-যাত্রা; সে-সূত্রে ধর্মীয় অসারতা প্রমাণের সুযোগও পেয়েছেন ঔপন্যাসিক এবং জয়গুনের ধর্মীয় অপ-সংস্কার মুক্তির মাধ্যমে তার প্রতিকারের উপায়ও তিনি কল্পনা করেছেন। ক্ষুধার্ত জয়গুন-সত্তা ঈশ্বরহীন এক বিরূপ প্রান্তরে নিপতিত। তাকে উদরের আহার জোগাড় করতে হয় কায়ক্লেশে,একান্ত নিষ্ঠুর শ্রমে। অধিবিদ্যাগত কোনো শক্তি তার সংকটের কোনো অলৌকিক সমাধান নিয়ে আসবে তা সে ভাবে না।

মানবিকতাবোধে উজ্জীবিত আবু ইসহাক 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের চুম্বক-চরিত্র জয়গুনের মাঝে দুর্লভ মানবীয় গুণের সমাবেশও ঘটিয়েছেন। নিম্নবর্গের প্রতিনিধি জয়গুনের মাঝে কখনওই নিম্নবর্গীয় সংকীর্ণতা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতার মতো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস, দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী সংগ্রামী জীবনের রুক্ষতা জয়গুনের কাছ থেকে তার মানবীয় প্রবৃত্তিগুলো কেড়ে নিতে পারে নি, আর পারে নি বলেই ঈদের দিন সামান্য মিষ্টান্ন তৃপ্তি মিটিয়ে না খেয়ে শফির জন্য তুলে রেখেছে, অত্যন্ত দ্রুত পথ-চলার তাগিদেও অন্যের ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে নৌকা চালাতে নিষেধ করেছে, যদিও ক্ষেতটা তার নয়, ঐ ধানে তার সামান্য অধিকারও নেই। এ প্রসঙ্গে তার উক্তি স্মতর্ব্য –

> আমাগ খেত নাই বুইল্যা তুই অমন ফুলে ভরা ধানের উপর দিয়া কোষা চালাবি ? যা খাইয়া মানুষ বাঁচে, হেইয়া লইয়া খেলা! খেতের আইল দিয়া যা।[৫২]

ক্ষেতের আল দিয়ে যেতে দেরি হবে শুনেও তার নির্বিকার প্রত্যুত্তর 'অউক দেরী ।' অথচ সময়ের মূল্য যে তার কাছে নেই তা নয় বরং সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই তার দিন চলা, তবুও মানুষের ক্ষতি তার নিকট অক্ষমণীয় মানবতার মহিমায় উদ্ভাসিত। জয়গুন তাই জীবনযাপনের সব মলিনতাকে অতিক্রম করে স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল।

প্রখর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন জয়গুন নিরন্তর জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছে সর্বগ্রাহ্য এক দৃঢ় ব্যক্তিত্ব। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে নিয়তিবাদী বটে, যেমন – মায়মুনের বিয়ের প্রসঙ্গে তার মত – "নছিবে যদি ঐখানে ভাত লেইখ্যা থাকে, তয় অইব। কার কোনখানে দানা-পানি লেহা আছে, খোদা জানে।"[৫৩] আবার ঘরের চালে ছন না থাকায় ঝড়-বৃষ্টিতে ভেজা-প্রসঙ্গে সে নির্বিকার –

Dhaka University Institutional Repository

কপালে আছে ভিজতে অইব, ভিজমুই।[৫৪]

তবে যখন কোন সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে নিয়তিবাদী হয়ে আর থাকেনি। দৃঢ় কণ্ঠে নিজের বিবেচনা প্রসূত মত প্রকাশ করেছে। দুইবার বিয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে ঘর বিমুখ করেছে – সেটাই একমাত্র সত্য নয়। করিম বক্‌শকে পুনরায় বিবাহে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে তার প্রবল আত্মসম্মান, সে দৃঢ়ভাবে এ বিয়েতে তার অমত জানিয়ে উচ্চারণ করেছে –

যেই থুক একবার মাডিতে ফালাইছি, তা মোখ দিয়া চাটতে পারতাম না।[৫৫]

অথচ মোটামুটি সম্পন্ন গৃহস্থ করিম বক্‌শকে পুনরায় বিবাহ করলে নিরন্নতা ঘুচতো ; তার সন্তানেরাও পিতৃগৃহে দু'বেলা খেয়ে বাঁচতে পারতো। করিম বক্‌শের কাছ থেকে প্রাপ্ত দৈহিক নির্যাতন ও 'বিনাদোষে তালাক' জয়গুনকে হয়ত বিমুখ করেছে তার প্রতি কিন্ত প্রবল মাতৃত্বের অধিকারী জয়গুন তার সন্তানদের মুখ চেয়েও কি ফিরে যেতে পারে নি পূর্বতন স্বামীর গৃহে ? কেবল ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিরূপতার কারণ তার সন্তানস্নেহের চাইতেও কি বড় হয়ে উঠেছে ? সঙ্গত কারণেই এসব প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করাতে হয় তাকে এবং মাতৃত্বের Archetype বলে বিবেচিত জয়গুনের এই কার্যের পেছনে ব্যক্তিগত বিরূপতা তার ব্যক্তিত্বকে দৃঢ় করলেও অজুহাত হিসেবে অত্যন্ত নাজুক বিবেচিত হয়। গভীর অনুসন্ধানে ভিন্ন তাৎপর্যেরও সন্ধান মেলে। শরিয়ত মতে পূর্ব স্বামীকে পুনরায় বিয়ে করতে হলে প্রথমে অন্য একজনকে বিয়ে করে তালাকপ্রাপ্ত হতে হয়। করিম বক্‌শের তাতে আপত্তি ছিল না। সে শরিয়ত মেনেই পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করতে চেয়েছে; কিন্ত জয়গুনের আপত্তি স্পষ্ট –

– শরিয়ত মত আগে একজনের লগে সাঙ্গা বইয়া হেইখান তন তালাক লইয়া তারপর ?

ওহোঁ। .....

–শরিয়তে থাকলেও আমি পারতাম না।[৫৬]

দীর্ঘদিনের সংগ্রামশীলতায় রূপান্তরিত,আত্ম-নির্ভর,আত্মসচেতন জয়গুনের পক্ষে ব্যক্তিত্বের অবমাননা সম্ভব নয়, সে আর এখন পুতুল-বউ নয় যাকে যেমন-খুশি তেমন করে খেলা যাবে, এখন সে একজন পরিপূর্ণ মানুষ, একজন ব্যক্তি। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে তাই করিম বক্‌শের গৃহে তার ফেরা হয় নি। জয়গুনের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক যে শ্রেণীর মানুষকে রূপায়িত করেছেন আপাতদৃষ্টিতে তারা জীবন-যুদ্ধে পরাজিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা পরাজিত হয়েও থেমে যায় না ,হেরে যায় না, নতুন করে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় – সেখানেই তাদের জয়, আবু ইসহাকের জীবনদর্শন জয়গুনের মধ্য দিয়ে সেই জয়কে সূচিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

জয়গুনের মাতৃত্বের চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি আবু ইসহাক আলোচ্য উপন্যাসে আরও দুটি নারী চরিত্রকে মাতৃত্বের অমল বিভায় উদ্ভাসিত করেছেন – একজন জয়গুনেরই বড় ভাইয়ের স্ত্রী শফির মা, অন্যজন শহরের পটভূমিতে স্থাপিত কন্ট্রাক্টরের গৃহিণী। জয়গুনের সমদুঃখী পঞ্চাশোর্ধ একচোখ অন্ধ শফির মা নয় সন্তানের জননী । কিন্তু তার জীবিত সন্তান মাত্র একটিই – শফি। বাকি আটজনের চারজন আঁতুড়েই মার গেছে, দুটি কলেরায় , একটি বসন্তে এবং অপর সন্তান মফিকে গ্রাস করেছে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ। আকালের সময় সে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে কিন্তু তার মা এখনও তার বেঁচে থাকার আশায় উজ্জীবিত, তার প্রতীক্ষায় কাতর। ভিক্ষা করে সে তার নিজের ও সন্তান শফির অন্ন জোগায়। গদু প্রধান ও করিম বক্‌শের দূতিয়ালি এবং মায়মুনের বিয়ের ঘটকালি করে সে ।

শফির মায়ের চরিত্রে বড়ু চণ্ডীদাসের ' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যের ' বড়াঞি বুড়ি'র ছায়া পাওয়া যায়। তার কার্যকলাপ, তার বিলাপ সবকিছুতেই সে ছাপ স্পষ্ট কিন্তু মাতৃত্বের প্রশ্নে তা ভিন্ন। সন্তানের প্রতি শফির মায়ের স্নেহ-ব্যাকুলতা বড়াঞি চরিত্রে অনুপস্থিত, বস্তুত এই দিকটিই তার চরিত্রকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। বড় কথা,বড়াঞির মত কূটচাল নেই শফির মার চরিত্রে। কোনো ধোঁকা বা প্রতারণার পথে সে জয়গুনকে প্ররোচিত করে নি।

সামান্য সময়ের জন্যে কাহিনীতে স্থান পেলেও এবং মূল কাহিনীর স্রোতে অবস্থান না থাকলেও রশীদ কন্ট্রাক্টরের গৃহিণী পাঠক মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রাখতে সমর্থ হয়েছে তার স্নেহ বিগলিত অন্তরের কল্যাণে। অমানবিক শহুরে সুযোগ-সন্ধানী লোক রশীদ সাহেব , পেশা যার কন্ট্রাক্টরি, হাসুকে দিয়ে সে মোট বওয়ায়, ক্যাফের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখে ঘন্টার পর ঘন্টা তারপরও পাঁচ আনা পয়সা দিতে তার কার্পণ্য । হাসুকে সে 'পাঁচ আনা' দিতে সম্মত হয় যখন হাসু তার গা টিপে দেয়। এমন ধূর্ত ও নির্মম চরিত্রের বিপরীতে ঔপন্যাসিক স্থাপন করেছেন তার গৃহিণীকে – মাতৃত্বের মহিমায় উজ্জ্বল করে। স্বামীর কঠোরতার প্রতিবাদ করে সে হাসুকে উদ্ধার করে তার কাছ থেকে, তাকে খাবার এবং একটা টাকা দেয়। হাসুর মাঝে সে কলকাতার দাঙ্গায় হারিয়ে যাওয়া তার মেজ ছেলেকে প্রত্যক্ষ করে ব্যথিত হয়। চিরন্তন মাতৃমূর্তির মহিমা পরিলক্ষিত হয় রশীদ-গৃহিণী মাঝে।

Dhaka University Institutional Repository

নারী চরিত্র অঙ্কনে আবু ইসহাক অপেক্ষাকৃত সহানুভূতিশীল বটে, কিন্তু বাস্তবতা বিবর্জিত নয়। তাঁর অভিজ্ঞতায় জয়গুন ও রশীদ গৃহিণীর মতো মানবিক নারী যেমন আছে , লালু ও গেদির মায়ের মতো খেটে-খাওয়া নারী আছে, তেমনি আছে মায়মুনের শাশুড়ি সোলেমান খাঁর স্ত্রী, পাড়ার সোনা চাচী ও গেদু প্রধানের স্ত্রীর মতো নির্মম চরিত্র। মায়মুনের শাশুড়ি চরিত্রটি একটি টাইপ চরিত্র। গ্রাম বাংলার স্বার্থপর-অত্যাচারী-নির্মম শাশুড়ি চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছে সে-চরিত্রটি। পাড়ার সোনা চাচীর চৌদ্দটা ডিম ফুটবে তবুও তার মুরগী তা দেবে বলে সে মায়মুনের দুটো বাচ্চার একটা দাবি করে, অনেক কাকুতি মিনতি করায় সে ছাড় দিতে রাজি হয় বটে তবে সাময়িক সময়ের জন্য। তার দাবিকৃত এক হালি ডিম পূরণ করা না হলে মায়মুনের হাঁসকে পাঁতিশিয়ালে নিয়ে যাবে বলে অভিশম্পাত করতেও তার দ্বিধা হয় না। বস্তুত মানব-সত্তাই ইতি ও নেতিবোধের জটিল জালে বিন্যাসিত। কিন্তু গভীরভাবে তাকালে খেয়াল করা যায় যে, আবু ইসহাক যে নারীদের নির্মমতার কাহিনী ব্যক্ত করেছেন তারা প্রত্যেকেই উচ্চবিত্ত কিংবা স্বচ্ছল পরিবারের – দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত নয়। অন্যদিকে নিম্নবর্গের দারিদ্র্য-পীড়িত, জীবন যুদ্ধে ন্যুব্জ নারীরা মানবিকতায় উজ্জ্বল, নেতিবাচক অন্তত নয়। প্রকৃতপক্ষে লেখকের বিশেষ জীবনদর্শনই এর একমাত্র কারণ।

জয়গুনের পরই 'সূর্য-দীঘল বাড়ী ' উপন্যাসের সবচেয়ে শক্তিশালী ও জীবন্ত চরিত্র করিম বক্শ। এ চরিত্রটি সরলরৈখিক নয়, বেশ কয়েকটি বিস্ময়কর বাঁক আছে এ চরিত্রে। প্রথমাবধি করিম বক্শ কর্কশ, রুক্ষ এবং বদমেজাজি – গ্রাম বাংলার আধিপত্যবাদী পুরুষ চরিত্রের প্রতিভূ সে। স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতনের নির্মমতা এবং নারীর অসহায়ত্বের চিত্র এ চরিত্রের মাধ্যমে অনেকটা রূপায়িত হয়েছে। করিম বক্শের লাঠির আঘাতে তার প্রথম স্ত্রী মেহেরুনের মৃত্যু হয়েছিল। রাত করে যাত্রা গান শুনে বাড়ি ফিরে দরজা খুলতে দেরি হওয়ার অপরাধে গর্ভবতী স্ত্রীকে আঘাত করতে তার বিবেকে এতটুকু বাধেনি, পরে মৃতা স্ত্রীর গলায় রশি বেঁধে পার্শ্ববর্তী গাব গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা সাজিয়েছে নিজেকে বাঁচাতে। জয়গুনকে ঘরে এনেও তার অত্যাচারের মাত্রা কমে নি বিন্দুমাত্র। এত অত্যাচার সহ্য করেও জয়গুন মন পায় নি তার, দুর্ভিক্ষের বছর বিনাদোষে তাকে তালাক দিয়েছে এবং দুই কন্যাসহ তাকে বিতাড়িত করেছে। তার তৃতীয় স্ত্রী আঞ্জুমানও সব সময়ই সন্ত্রস্ত থেকেছে তার কোপদৃষ্টি থেকে বাঁচতে। গ্রামের লোকজন রুক্ষ স্বভাবের জন্য তাকে এড়িয়ে চলে, তার প্রথম পক্ষের ছেলেও তার বদমেজাজ সহ্য করতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে শ্বশুর বাড়িতে চলে গিয়েছে – এ

Dhaka University Institutional Repository

সমস্ত ঘটনার বিবরণে করিম বক্‌শ সম্পর্কে সহজেই একটি সমাধানে পৌছা যেতো যদি না তার চরিত্রের বিবর্তন ঘটতো উপন্যাসের শেষাংশে।

আপাতদৃষ্টিতে রুক্ষ-নির্মম স্বভাবের করিম বক্‌শের হৃদয়ের কোমল জায়গাটি খুঁজে পাওয়া যায় কাসুর প্রতি তার আচরণে। কাসুর প্রতি তার পিতৃস্নেহ এবং সর্বদাই তাকে হারাবার ভয় – ক্ষণকালের জন্য পাঠককে বিভ্রান্ত করে সত্য কিন্তু পরক্ষণেই কাসু যাতে তার মায়ের কাছে যেতে না পারে সেজন্য গরুর দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা, তার মায়ের মৃত্যুসংবাদে কচি-মনকে দুঃখ-ভারাক্রান্ত করা বা হাসুর সাথে মেশার জন্য তাকে নির্যাতন করা – সবকিছু তার পূর্বতন হিংস্র স্বভাবকেই নির্দেশ করে। কাসুর মুখে 'বাবা' ডাক শোনার জন্য সে ব্যাকুল অথচ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে তাকে 'গোঙাবুড়ি', 'ছালাবুড়ি'র ভয় দেখাতেও তার দ্বিধা নেই। কাসু অসুস্থ হয়ে পড়লে, তার জীবনের সংশয় দেখা দিলে সে ফকিরের শরণাপন্ন হয়েছে তার নিজস্ব মানসিকতায়, ছেলের সুস্থতার বিনিময়ে সে ' দুইডা খাসি সদকা' দিতে প্রস্তুত। পুত্রকে নিজের আয়ত্তে রাখার মানসে, জয়গুন থেকে দূরে রাখার অভিপ্রায়ে সে বিভিন্ন সময়ে নানা ছল-চাতুরির আশ্রয় নিয়েছে, আবার গভীর পুত্র-স্নেহই তাকে তাড়িত করেছে অসুস্থ কাসুর পাশে জয়গুনকে ফিরিয়ে আনতে। একদিকে পুত্রের প্রতি তার হৃদয় স্নেহ-বিগলিত, অন্যদিকে নিজের ঔরসজাত কন্যার বিবাহে পর্যন্ত উপস্থিত থাকাতে অনাসক্তি – তার চরিত্রের বৈপরীত্যকে স্পষ্ট করে, পাঠককে ভাবায়। প্রকৃত বিচারে তার এই স্ববিরোধিতা সমাজ সৃষ্ট; যে সমাজের দৃষ্টিতে পুত্র হল 'বংশের চেরাগ' এবং কন্যা ' মাথার বোঝা ' সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই তো প্রতিনিধি করিম বক্‌শ – তার আচরণ, তার মানসিকতা, তার কার্যকলাপ সমস্তই সমাজ-নিয়ন্ত্রিত। এক কথায় পুরুষতান্ত্রিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ সমাজের By Product সে। পরবর্তীকালে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনোজাগতিক পরিবর্তনও কিছুটা এসেছে – এক কালের স্ত্রী হত্যা ও নির্যাতনকারী করিম বক্‌শের মনে নেশা ধরিয়েছে সেবাক্রান্ত জয়গুনের মহিয়সী রূপ, যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে সে জয়গুনকে পুনরায় ঘরে তুলতে চেয়েছে ; এমনকি জয়গুনের মন গলাবার জন্য ' নাগর বাইদ্যার হাতে পায়ে ধইর‍্যা' পান পড়া যোগাড় করেছে – জয়গুনের জন্য সে স্ব বিসর্জন দিতে রাজি, এমনকি নিজের সর্বস্ব জমি পর্যন্ত।

জয়গুন সম্পর্কে ভাবান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আমূল পরিবর্তিত করিম বক্‌শের হৃদয়ে পরিত্যক্ত কন্যার প্রতিও মমত্ববোধ জেগেছে। আর এই নবতর মানসিকতায় করিম বক্‌শ ক্ষণকালের জন্য হলেও

Dhaka University Institutional Repository

অনুতপ্ত হয়েছে তার পূর্বকৃত অপরাধের জন্য। তার মনোজাগতিক এই রূপান্তরকে লেখক ভাষা দিয়েছেন এভাবে –

> করিম বক্‌শের মমতাহীন লাল চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। হাত বাড়িয়ে মায়মুনকে ধরতে যায়। কিন্তু তার হাত কাঁপছে কেন ? মেহেরনকে হত্যা করার সময় যে হাত কাঁপে নি, মায়মুনসহ জয়গুনকে মেরে তাড়িয়ে দেয়ার সময় যে হাত তার বিচলিত হয় নি, আজ সেই হাত কাঁপছে কেন? সেই হাতের শক্তি কোথায়? নিজের মেয়েকে স্পর্শ করার শক্তিও যে নিঃশেষ হয়ে গেছে। মায়মুনকে স্পর্শ করার অধিকার যেন হারিয়েছে সে।[৫৭]

স্ত্রী ও কন্যা অর্থাৎ নারীর প্রতি পরিবর্তিত মানসিকতা করিম বক্‌শকে কেবল পুরুষ থেকে একজন মানুষে রূপান্তরিত করেছে। তাই জয়গুন ও তার সন্তানদের দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র তথাকথিত ভূত ক্ষেপে উঠলে সে ছুটে গিয়েছে জোবেদ আলি ফকিরের কাছে। তার মনোজাগতিক ভূতের-ভীতিকে জয় করে সে জয়গুন ও তার সন্তানদের বিপদমুক্ত করার অভিপ্রায়ে অমাবস্যার অন্ধকারে সূর্য-দীঘল বাড়ীর চারপাশে ফকিরের মন্ত্রপূত গজাল পুঁততে গিয়েছে। সেখানে অশরীরী শক্তির পরিবর্তে সকল অপকর্মের হোতা গদু প্রধানকে আবিষ্কার করে বিস্মিত, পরক্ষণে ক্রুদ্ধ হয়েছে এবং সর্বশেষে গদু প্রধানের হাতে প্রাণ হারিয়েছে । করিম বক্‌শের এই অপমৃত্যু তার পূর্বতন অপরাধ বা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ; যা পাঠক হৃদয়কে তৃপ্তি দিয়েছে। কাহিনীর প্রয়োজনে এবং লেখকের জীবনদর্শনের বাস্তবতায় এ মৃত্যু অবধারিত ছিল।

'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সৃষ্ট আরেকটি প্রথাগত চরিত্র গদু প্রধান। এ উপন্যাসে চল্লিশের দশকের প্রবল ধর্মভাবাপন্ন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন আগ্রাসী গ্রাম-সমাজকে চিত্রিত করা হয়েছে এবং এই গ্রামীণ সমাজের আবশ্যিক অনুষঙ্গ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে গদু প্রধান চরিত্রটি। এই চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতা উন্মোচনে ঔপন্যাসিক জটিলতার সৃষ্টি করেননি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌-র 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্রের মতো গদু প্রধান চরিত্রে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা মনোজাগতিক-মুক্তির ইঙ্গিত নেই। সুতরাং চরিত্রটি সরলরৈখিক ভাবে গ্রামীণ সমাজের শোষক শ্রেণীকে প্রতিনিধিত্ব করেছে।

অঢেল 'জাগা-জমিনের' মালিক গদু প্রধান গ্রাম সমাজের একচ্ছত্র অধিপতি। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ পরবর্তী তার রমরমা অবস্থা বা অঢেল সম্পত্তি যে অসহায় ও দুর্বল গ্রামবাসীদের শোষণ করেই সৃষ্ট তার প্রমাণ মেলে চালের মূল্যবৃদ্ধির কামনার মধ্য দিয়ে। চালের মূল্য বৃদ্ধিতে লোকে না খেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

মরলেও তার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে – তার এ ভাবনার উৎস বৃহত্তর স্বার্থের মঙ্গল নয়, ব্যক্তিস্বার্থ-সিদ্ধি। দরিদ্র লোকদের জন্য বরাদ্দ চিনির ভাগ নিতে সে ছাড়ে না, একদিকে গ্রামের লোকদের মনে ভীতি উৎপাদন করে, অন্যদিকে ফুড কমিটির চেয়ারম্যান খুরশীদ মোল্লার সামাজিক নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে নিজস্ব বরাদ্দের পরিমাণ নিশ্চিত করে। গ্রাম প্রধান হিসেবে গ্রামের ভাল-মন্দ দেখার দায়-দায়িত্বের সুবাদে সে জয়গুনকে শাসন করতে চায়। বস্তুত,এর পেছনে তার স্বার্থ-সিদ্ধির হীন মনোবৃত্তিই কার্যকর। তিনজন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে কামনা করে জয়গুনকে। স্বামী-স্ত্রীর তিক্ত সম্পর্কে পোড়-খাওয়া জয়গুন গদুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। গ্রাম্য-মোড়ল গদু এই প্রত্যাখ্যানের জবাব দেয় ইমামের সঙ্গে সমঝোতায়। বস্তুত অর্থনীতি ও ধর্মনীতি এই দুইয়ের যোগসাজগেই জয়গুনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। মায়মুনের বিয়েতে বেকায়দায় ফেলে জয়গুনকে তওবা করানোর মূল পরিকল্পক সে-ই। 'গদু প্রধানের ইচ্ছা-অনিচ্ছা শেষ পর্যন্ত গ্রামের সকলের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় পর্যবসিত।'[৫৮] সমাজে তার মতের গুরুত্ব সর্বাধিক বলে জয়গুনের জীবন-জীবিকার ভাবনা গ্রাহ্য হয় না সামাজিক দৃষ্টিতে । তাকে তওবা করতেই হয়। পরবর্তীতে তওবা ভঙ্গ করে যখন জয়গুন আবার জীবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তখন তাকে শায়েস্তা করার অভিপ্রায়ে রাতের অন্ধকারে ঘরের চালায় ঢিল ছুড়ে গদু প্রধানই জীবন্ত করে তোলে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র ভূতকে। উপন্যাসের প্রথমাংশেই 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র ভূতের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সঠিক বিবেচনায় গ্রাম্য কুসংস্কারের প্রচারক এবং সুযোগ মতো সে-কুসংস্কারকে নিজের স্বার্থে ব্যবহারের হীনোদ্দেশ্য গদু প্রধানের চরিত্রে বিদ্যমান। এই চরিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক শোষক চরিত্র উন্মোচনের পাশাপাশি, গ্রাম্য-কুসংস্কার যে তাদেরই সৃষ্ট, এবং লালিত – এই ভাবনাও জোরালোভাবে প্রকাশ করেছেন। সে দিক দিয়ে গদু প্রধান চরিত্র লেখকের মানস অভিপ্রায়কেই সিদ্ধ করেছে।

এ উপন্যাস মূলত 'উন্মুলিত জয়গুন পরিবারের জীবন-অন্বেষার কাহিনী'[৫৯] এবং জয়গুনের প্রতিপক্ষ গদু প্রধান। ঔপন্যাসিক যেহেতু জয়গুনের মাধ্যমে নিম্নবর্গের মানুষের কাহিনী বিবৃত করেছেন, সুতরাং বলা যেতে পারে যে বৃহত্তর অর্থে গদু প্রধান চরিত্রে সমাজের শোষক শ্রেণীকে ধারণ করেছেন। জয়গুন ও গদু প্রধানের দ্বন্দ্বই মূলত শ্রমভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের মূল বক্তব্য।

কেবল জয়গুনের প্রতিপক্ষ হিসেবে নয়, সাধারণ গ্রামবাসীর বিপরীতেও গদু প্রধান চরিত্রের অমানবিক দিকটি স্পষ্ট। গ্রামের নিরন্ন মানুষ,যারা তিনবেলা পেট ভরে ভাত খেতে পায় না,তাদের

Dhaka University Institutional Repository

সমাবেশে তার 'সাতচল্লিশটা' রসগোল্লা খাওয়ার গল্প, ছয় ভাগার পরিবর্তে নিজ জমিতে সাতভাগায় ধান কাটতে কৃষকদের বাধ্য করার মধ্য দিয়ে তার অমানবিকতা প্রকাশিত হয়েছে এবং নিজ অস্তিত্ব-রক্ষার তাগিদে করিম বক্শকে হত্যার মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের চূড়ান্ত হিংস্র স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গদু-প্রধানের মতো মানুষদের অসাধ্য বলে কিছু নেই – হীন স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে মানুষ-হত্যা করার মতো জঘন্য অপরাধেও বিন্দুমাত্র ভাবিত নয় – এ চরিত্র কেবলই ঔপন্যাসিক সৃষ্ট নয়, গ্রাম বাংলার বাস্তবতাতেও বিদ্যমান।

দেশ বিভাগের ঐতিহাসিক বাস্তবতা গ্রাম্য ডাক্তার রমেশের মাধ্যমে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে এসেছে। উপমহাদেশের রাজনৈতিক পটভূমি এবং এ সম্পর্কে আবু ইসহাকের নিজস্ব ভাবনা রূপায়িত হয়েছে এ চরিত্রের মাধ্যমে। গ্রাম্য এ ডাক্তারের মধ্যে মানবিক বোধের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। তার স্ত্রী দেশ বিভাগের হুজুগে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যেতে চাইলেও সে রাজি নয়। বিশ বছর অক্লান্তভাবে রোগী দেখে 'চিকিৎসা বিজ্ঞানে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা' থাকলেও অর্থনৈতিক সফলতা তার জীবনে আসে নি। তার পরোপকারের ফল ফলেছে তবে তা 'তিতো, বিষাক্ত।' তবুও গ্রামের লোকের জন্য তার মমতার অন্ত নেই। গ্রামের অপর দুই ডাক্তার পূর্বেই দেশত্যাগ করে চলে যাওয়ায় গ্রামের একমাত্র ডাক্তার হিসেবে তার ভাবনা – ' আমিও যদি চলে যাই, তবে এরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?'[৬০] তার মানবিকবোধই তাকে সামাজিক সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করার শক্তি যুগিয়েছে। দেশবিভাগের দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনীতিকে অস্বীকার করেছেন তিনি। উপমহাদেশের রাজনৈতিক উন্মাদনার পেছনে তিনি দেখতে পেয়েছেন 'স্বার্থান্ধ হিংস্রতা।' ধর্মচেতনার ঊর্ধ্বে দেশমাতৃকাকে স্থান দিয়েছেন তিনি। তাঁর স্বচ্ছ চিন্তাধারা সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশেও নতুন আশার আলো জ্বালায় –

> আমাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু-মুসলমান আপনজনের মত কত যুগ যুগ ধরে কাটিয়েছে এ মাটিতে। একের ওপর নির্ভর করে বেঁচে উঠেছে আর একজন। একজন যুগিয়েছে ক্ষুধার অন্ন, আর একজন দেখিয়েছে আলো।[৬১]

হিন্দু মুসলমান বিভেদের উত্তাল সময়ে আবু ইসহাক রমেশ ডাক্তারের মাধ্যমে যে উদার মানবিকতার আহ্বান জানিয়েছেন তাতে তাঁর নিজস্ব দর্শনই প্রকাশিত হয়েছে। কিছুটা বক্তব্যধর্মী, প্রচারমুখী হলেও রমেশ ডাক্তারের উপাখ্যান সমকালের এবং চিরন্তন মানবিকতার তাৎপর্যে ভাস্কর। এ উপাখ্যানকে 'অপ্রয়োজনীয়ভাবে কিছুটা দীর্ঘ ও শিথিল-বিন্যস্ত'[৬২] বলে সমালোচক মত প্রকাশ করেছেন। তবে

Dhaka University Institutional Repository

লেখকের ব্যক্তিগত দর্শনের সুস্পষ্ট অনুভবের জন্য, এ চরিত্রটি সম্পর্কে স্বচ্ছতা দানের জন্য এইটুকু বিস্তৃতির প্রয়োজন ছিল বলে আমাদের ধারণা।

'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে সংগ্রামী জয়গুনের কিশোর প্রতিনিধি তারই সন্তান হাসু। দুর্ভিক্ষ-উত্তর বাস্তবতায় নিজেকে এবং পরিবারের সদস্যদের বাঁচানোর তাগিদে মায়ের পাশাপাশি সেও প্রবেশ করেছে কর্মক্ষেত্রে, ছোট্ট কাঁধে তুলে নিয়েছে মোটের বোঝা। স্টেশনে ও জাহাজঘাটে নম্বরী কুলিদের চোখ এড়িয়ে, তাদের গালি-গালাজ সহ্য করে সাধ্যাতীত ওজনের ভারি মোট দিনের পর দিন বহন করে দিনান্তে সে আয় করেছে দশ-বারো আনা পয়সা এবং সমস্তটাই তুলে দিয়েছে মায়ের হাতে, সংসারের প্রয়োজনে। মাঝে মাঝে অতিরিক্ত ভার বহন করায় ঘাড়ে এসেছে ব্যথা কিন্তু তেল-মালিশ করে নিয়ে পরদিনই সে ছুটেছে কর্মক্ষেত্রে – একটা দিনও যে কামাই দেয়ার উপায় নেই – নইলে আধ-পেটা খাবারও মিলবে না দিনান্তে। পেটের ক্ষুধা মেটাতে নদী সাঁতরে জাহাজে উঠে প্যাসেঞ্জার ধরে সে, ইট ভেঙ্গে, ইট বহন করে যেভাবে পারে জীবিকা সংগ্রহ করে। জীবনের কঠোর সংগ্রামশীলতা নিতান্ত কিশোর হাসুর চোখ থেকে কেড়ে নিয়েছে সব স্বপ্ন। তবুও দেশ স্বাধীন হওয়ার আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছে সে –

> আর আমাগ কষ্ট অইব না, কেমুন গো মা? মাইন্‌ষে কওয়াকওয়ি করতে আছে ঘাডে পথে। দ্যাশ স্বাধীন অইল। এইবার চাল হস্তা অইব। মানুষের আর দুক্‌খ থাকব না।[৬৩]

দুঃখ দূর হবার, সুখী হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে সারাদিন সে মিছিলে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি তুলে গলা ভেঙেছে, বাড়িতে ফিরেও তার উত্তেজনা কমেনি, মাকে অনুরোধ করে বানিয়েছে চাঁদ-তারা আঁকা সবুজ পতাকা এবং তা গাছের ডালে ঝুলিয়ে শফি ও মায়মুনকে দিয়েও নতুন রাষ্ট্রের জয়ধ্বনি দিয়েছে। অচিরেই তার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে কিন্তু জীবন সংগ্রাম থেমে যায়নি। কঠোর সংগ্রামী মানুষের আড়ালে মাঝে মাঝে তার কিশোর মনও হয়েছে সক্রিয়। মার কাছে 'আন্ডা বিরান' খাওয়ার বায়না, নুন আনতে পান্তা ফুরালেও ঈদের দিন 'শিন্নি' খাওয়ার শখ মেটাতে গুড় আর নারিকেল কিনে আনা এসবই কিশোর মনের সুপ্ত বাসনার প্রকাশক।

তের বছর বয়সেই হাসু দেখে ফেলেছে জীবনের রুক্ষ বাস্তবতার অনেক দিক। কালো বাজারী, মজুতদারী, ফুড কমিটির মেম্বার এবং মসজিদের ইমামের কার্যকলাপ তার মনকে বিক্ষুব্ধ করেছে, বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে সমাজের প্রতি; তবুও সমাজ থেকে সে ছিটকে পড়ে নি। মায়ের প্রতি তার

Dhaka University Institutional Repository

অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, তাই লোকে মাকে খারাপ বললে তারও খারাপ লাগে। মাকে সে বাইরে যেতে বারণ করে সংসারের পুরো দায়িত্ব নিতে চায়, তার বক্তব্য –

না পাইলে না খাইয়া মইর‍্যা যাইমু। হেই অ ভালা,
ত মাইনষের কতা আর সয় না।[৬৪]

সমাজ থেকে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না পেলেও তার সমাজ সংশ্লিষ্টতার অনুভব এখানে স্পষ্ট। ছোটবোন মায়মুনের প্রতিও তার স্নেহের প্রকাশ দেখা যায়। বোনের জন্য সে চুড়ি কিনে আনে, মায়ের কাছে মায়মুন মার খেলে তার চোখ ছলছল করে ওঠে। সৎ ভাই হলেও কাসুর জন্য কদমা এবং চড়কি কিনে গোপনে দিয়ে আসে, ঈদের দিনে নিজের জন্য পুরোনো টুপি রেখে কাসুর জন্য নতুন টুপি কিনতে তার দ্বিধা হয় না। প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হলেও রশীদ গৃহিণীর দেওয়া ভাত গলধঃকরণ করতে পারে না সে অভুক্ত মা ও বোনের কথা মনে করে। মা ও ভাই-বোনের প্রতি মমতা হাসু চরিত্রকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। অন্যদিকে জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে শিখিয়েছে দায়িত্বশীল হতে। সামাজিক অসাম্য, অন্যায় তাকে ব্যথিত করেছে কিন্তু নিজে সে অন্যায় করতে পারে নি; ফুড কমিটির চিনি বাজারে পেয়েও তা না কিনে সে গুড় কিনেছে। মাকে লুকিয়ে সিনেমা দেখার বিলাসিতা তার নিকট প্রশ্রয় পায় নি । নিজের পাতের ভাত মায়ের জন্য তুলে রাখার মধ্য দিয়ে তার মানবিকতার প্রকাশ ঘটেছে। সমালোচকের দৃষ্টিতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের অপরাজেয় কিশোর চরিত্র অপুর পথ ধরে হাসু চরিত্রটি সৃষ্ট। অপু ও হাসু উভয়ের জীবনে অভাব বা দারিদ্র্য থাকলেও অপুর চরিত্রে প্রকৃতি-সংলগ্নতা এবং হাসুর চরিত্র দুর্ভিক্ষ-জনিত জীবন-সংলগ্নতা প্রাধান্য পেয়েছে। তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই পরিবেশে সৃষ্ট এই দুই চরিত্রের মনোজাগতিক তফাতই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অপুর জীবন-কাহিনী গৌণ, মনোজগতই মুখ্য; এক স্বপ্ন-ভরা চোখে সে প্রকৃতির মাঝে জীবনের মহত্ত্ব বা বৈচিত্র্যকে খোঁজার চেষ্টা করেছে, অজানার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে নিয়তই জানতে চেয়েছে। অপরদিকে হাসু গ্রামে বেড়ে উঠলেও প্রকৃতি-সংলগ্নতা, কৈশোরসুলভ স্বপ্ন বা জিগীষা থেকে বিচ্ছিন্ন। পোড়-খাওয়া জীবন নিয়ে আপনজনদের অস্তিত্ব-রক্ষায় তার কেবলই জীবনের পথে ছুটে চলা। তার কৈশোর-দ্বন্দ্বের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না এ উপন্যাসে – তার মনোজগতের অন্য অনেক দিক বিকশিত না দেখিয়ে ঔপন্যাসিক কেবল এক কিশোর দিনমজুরের সংগ্রামী চরিত্রের কাহিনীই ব্যক্ত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসে মানবীয় চরিত্র বহির্ভূত অবচেতন চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়; যেমন – 'লালসালু' উপন্যাসের কথিত 'পীরের মাজার' এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের 'নদী' দুই-ই চরিত্র হয়ে কাহিনীতে দ্বন্দ্ব-জটিলতা এনেছে। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী ' উপন্যাসেও তেমনি অবচেতন চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় – যদিও তা খুব বেশি জোরালোভাবে উপস্থাপিত হয় নি। এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য গ্রাম বাংলার সামাজিক অবকাঠামো, সে-সূত্রে গ্রামীণ সমাজও এখানে চরিত্র হয়ে উঠেছে। উচ্চবর্গ বা শোষক শ্রেণী নিয়ন্ত্রিত গ্রামীণ সমাজ যে নিম্নবর্গের মানুষের প্রতিপক্ষ রূপে তাদের জীবনকে আরও প্রতিকূল করে তোলে – সে বাস্তবতারই প্রতিফলন ঘটেছে আলোচ্য উপন্যাসে। দেশ-বিভাগের সমকালীন পূর্ববঙ্গের গ্রামের বাস্তব প্রতিরূপ গড়ে আবু ইসহাক গ্রাম-বাংলার সামাজিক সংস্কার, বৈষম্য ও শোষণকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। নতুন রাষ্ট্রে গ্রামের অবকাঠামোগত পরিবর্তন হলেও 'সূর্য-দীঘল বাড়ী ' উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে চিরায়ত বাংলার গ্রামীণ-সমাজ।

এ উপন্যাসে 'ট্রেন'-এর উল্লেখ যথেষ্ট গুরুত্ব পাবার বিবেচনা রাখে। চল্লিশের দশকের বিশ্বে, বাংলাদেশে তো বটেই যোগাযোগের এক বিস্ময়কর মাধ্যম 'ট্রেন'। স্থলপথে 'ট্রেন' ই প্রথম দূরত্বের ধারণাকে পাল্টে দিয়েছিল। আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি বা শহর গড়ে উঠেছিল রেল যোগাযোগকে কেন্দ্র করেই। প্রকৃতপক্ষে 'ট্রেন' গতিশীলতার এবং বহির্যোগাযোগের প্রতীক হয়েই এ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। জয়গুনের জীবনকে গতিশীল করেছে রেলগাড়ি – সে গাড়িতে করে উত্তরে অর্থাৎ ময়মনসিংহে যায় এবং সস্তায় চাল কিনে গাড়িতে করে ফিরে এসে গ্রামে সে চাল বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। দেখা যাচ্ছে, তার জীবন ধারণে রেলগাড়ির ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ – এর সাহায্য ব্যতীত তার এরূপ জীবন-যাপন সম্ভব নয়। এ ছাড়াও রেলগাড়িতে চড়ে সে সংস্পর্শে আসে কত মানুষের; কত জায়গায় কত কিছু দেখে! এই অভিজ্ঞতা তাকে আরও বেশি আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে। জটিল পরিবেশের বিপরীতে জয়গুনের যে ব্যক্তি হয়ে ওঠা – তা কখনওই সম্ভব হত না যদি সে আজীবন এই গ্রামের ভৌগোলিক পরিসীমার সংকীর্ণতায় আবদ্ধ থাকতো। গ্রামের বাইরে তার বিচরণ বহির্বাস্তবতা সম্পর্কে তাকে জাগরিত করেছে বলেই তার পক্ষে সমাজকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়েছে। এই বহির্জগতের সঙ্গে জয়গুনের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম বলে 'ট্রেন'ও এ উপন্যাসের এক চরিত্র হয়ে উঠেছে। ট্রেনের গতিই কৃষিপ্রধান বাংলার লাজুক কুলবধূদের একান্ত নিজস্ব চেনা প্রাকৃতিক বেষ্টনের জীবন থেকে মুক্ত করেছে। তার অভিজ্ঞতার স্পেস বাড়িয়ে দিয়েছে। ট্রেন

Dhaka University Institutional Repository

একইসঙ্গে দেখিয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তির এই যন্ত্রযান কিভাবে গ্রামবাংলার অনাদি কালের প্রচল অর্থনীতির নিয়ম ভেঙে পুঁজিকে গতি দেয়। ইংরেজদের ঔপনিবেশিক বাংলায় নিসর্গলালিত জয়গুন শ্রেণী ট্রেনের কামরা,প্লাটফর্মের মত রাষ্ট্রীয় কানুন ঘেরা নতুন স্পেসে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। রেলগাড়ি না থাকলে জয়গুন,হাসু চরিত্রের সংগ্রামের পথ কতটা বেগবান ও ঝুঁকিপুর্ণ তা প্রকাশের প্রাবল্য পেত না।

'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং চরিত্র যেমন জীবন বাস্তবতায় জারিত, তেমনি এর ভাষা-সংলাপ এবং অন্যান্য পরিচর্যাতেও জীবন-ঘনিষ্ঠতার স্পর্শ মেলে। গ্রামীণ বাংলার দৈনন্দিন ও চিরায়ত জীবন বিষয় হিসেবে এসেছে বলেই এ উপন্যাস বর্ণনাধর্মী। তবে বর্ণনারও রূপভেদ আছে। পার্সি লুবক তাঁর ' The craft of Fiction (1965) গ্রন্থে জীবন সৃষ্টি পদ্ধতিকে শ্রেণীকরণ করেছেন চিত্রানুগ, দৃশ্যানুগ, নাট্যানুগ ইত্যাদি বিন্যাসে। গ্রামীণ জীবনের গতি-প্রকৃতি বিষয় হিসেবে এসেছে বলে এ উপন্যাসে মূলত চিত্রানুগ বর্ণনা (Pictorial Treatment) ব্যবহৃত হয়েছে লেখকের নিজস্ব পরিমার্জিত ভাষার বর্ণনে। যেমন–

> বাড়ীটার বড় আকর্ষণ একটা তালগাছ। এত উঁচু তালগাছ এ গাঁয়ের লোক আর কোথাও দেখেনি। কত শিশুর পরিচয় হল তাল গাছটির সঙ্গে। তারা বুড়ো হল, জীবন-লীলা সাঙ্গ করল। তাদের কত উত্তরপুরুষও গেল পার হয়ে। কিন্তু তালগাছটি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মত। কালের সাক্ষী হয়ে শত ঝড়-ঝাপটা উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাথা উঁচু করে।[৬৫]

লক্ষণীয় যে, লেখক ছোট ছোট সরল বাক্য ব্যবহার করেছেন এবং এর ভাষারীতি সাধু নয়, চলিত। ভাষা-নির্মাণে লেখক অলংকার বর্জন করেছেন যথাসম্ভব। 'মেদহীন' এ ভাষায় মাঝে মাঝে অলংকার ব্যবহৃত হলেও তাতে গ্রামীণ অনুষঙ্গ প্রাধান্য,পেয়েছে। যেমন–

> সমস্ত মাঠ কাদায় দৈ- দৈ হয়ে আছে।[৬৬]

অথবা

> কাউয়ার আন্ডার মতন কালা হইছে আসমান।[৬৭]

Dhaka University Institutional Repository

বাহুল্য বর্জিত বলে বা অতি অল্প কথার টানে ঘটনার বিস্তৃতি এড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টায় কখনও কখনও ভাষা হয়ে উঠেছে সংবাদধর্মী –

৯ ই অগ্রহায়ণ। আজ মায়মুনের বিয়ে।[৬৮]

অথবা

মায়মুন শ্বশুর বাড়ী থেকে চলে এসেছে। জয়গুন রাগে ফেটে পড়ে।[৬৯] ইত্যাদি।

জীবনের গতিশীলতা বা চরিত্রের দ্বন্দ্ব নির্মাণে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী ' উপন্যাসে সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে বহুল পরিমাণে – প্রায় লেখকের পরিমার্জিত বর্ণনার সম-পরিমাণ। অবশ্য এ উপন্যাসকে সংলাপপ্রধান বা ' ডায়ালজিক' বলা যেতে পারে না কোন ভাবেই। আর সে-কারণেই সংলাপের বহুলতা সত্ত্বেও বা বহু চরিত্রের মুখের সংলাপ স্থান পেলেও এতে 'বহুস্বরসঙ্গতি' বা 'পলিফেনি' সৃষ্টি হয় নি। বহুজনের মুখে কথা শোনা গেলেও, স্বর একটি – তা লেখকের নিজের। লেখকের বর্ণনায় 'চিত্রানুগ বর্ণনা' প্রাধান্য পেলেও সংলাপ বিনিময়ে 'নাট্যানুগ বর্ণনা' (Dramatic Treatment) লক্ষ করা যায়। যেমন –

গদু প্রধান বলে–

আমার পাঁচ সের আগে রাইক্যা, তারপর ভাগ কর। পাঁচ সের না পাইলে ফাডাফাডি আছে তোমার লগে।

-কাকে রেখে কাকে দেই ? আচ্ছা, দেখা যাবে। এ পাঁয়তারা আর কদ্দিন ভালো লাগে, বলুন! বিনে পয়সার চাকরি! ইচ্ছে হয় ছেড়ে দিই এই মুহূর্তে।

-না না, ছাড়বা ক্যাঁ ? তুমি না অইলে –

-ব্যাপার দেখুন না। এই খাটছি, তবু নাম নাই। সবাই বলে চোর।

-কোন শালা কয়? দেইক্যা নেই তার গর্দানে কয়ডা মাথা।[৭০]

এ ধরনের দীর্ঘ সংলাপ বিনিময় ব্যবহৃত হয়েছে উপন্যাসের বহুস্থানে। সংলাপ নির্মাণে উপভাষার ব্যবহার যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। চরিত্রদের সামাজিক-অবস্থান ও সমাজ-মানস চিহ্নিত করতে উপভাষা বেশ কার্যকর। এ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে ঢাকা জেলার পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা – কেননা জয়গুনেরা যে গ্রামে বাস করে বা এ উপন্যাসে যে গ্রাম এসেছে তা ঢাকা জেলার পার্শ্ববর্তী নিঃসন্দেহে; গ্রামের নাম বা অবস্থান উপন্যাসে উল্লেখ করা না হলেও তা অনুমান দুরূহ নয়। জয়গুন ও হাসু নৌকা করে বাড়ি থেকে ফতুল্লা স্টেশনের কাছাকাছি আসে এবং তাতে খুব বেশি সময় লাগে

Dhaka University Institutional Repository

না, অর্থাৎ ফতুল্লা বা ঢাকার কাছাকাছি তাদের বাস। সুতরাং এ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার উপন্যাসের চরিত্র ও কাহিনীর সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। ভাষাকে আরও জীবন ঘনিষ্ঠ করতে ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে জুড়ে দিয়েছেন বিভিন্ন গ্রাম্য-প্রবাদ, গ্রাম্য-গীতি এবং পুরাণের অনুষঙ্গ। যেমন-

ঘর নাই, দুয়ার দিয়া হোয় [৭১]

বা,

চাদের মইদ্যে ফান্দের কথা ক্যান আনো ?[৭২]

অথবা,

ও যদি মনে করে, উড় মাডি চুর করে[৭৩]

এ ধরনের বহু গ্রাম্য-প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায় এ উপন্যাসে। তাছাড়া বহু গীতও আছে। গ্রামের লোকেরা কথায় কথায় গীত বাঁধে, ধান-কাটা, ঝিঁ ঝিঁ ধরা, মাছ ধরা প্রভৃতি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত গ্রাম্য-গীত আছে বেশ কয়েকটি। ভূত ছাড়ানো, ভূতের ভয় তাড়ানো ছাড়াও গ্রাম্য বহু জ্ঞানগর্ভ বিষয়ও গ্রাম্য-গীতে এসেছে। যেমন –

আত আছিল, পাও আছিল,
আছিল গায়ের জোর,
আবাগী মরল ওরে
বন্দ কইর‍্যা দোর ।[৭৪]

গ্রাম্য-নারীর অসহায়ত্ব এবং জাগরণের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে এ গীতে।

পুরাণের গল্পও শোনা যায় শফির মার জবানিতে, তবে যথারীতি গ্রাম্য ভঙ্গিমায় –

শফির মা শুয়ে শুয়ে গল্প আরম্ভ করে – ভীম একদিন তার মা-রে জিগায় – 'মা, আমার তন্ বড় জোয়ান কে? তার মা কয় – 'আছে একজন। গাঙ্গের পাড় দিয়া আঁটলেই তার দ্যাহা পাইবা। তহন পৌষ-মাইস্যা রাইত। ভীম কতক্ষুন পর শীতে ঠক্ ঠক্ করতে করতে বাড়ীতে আহে। মায় জিগায় – দ্যাহা পালি বা'জান?' ভীম কয় – 'হ গো মা।'[৭৫]

মহাভারতের চরিত্র অবলম্বনে যে লৌকিক কাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে তা যেমন অহংকার না করার উপদেশ সম্বন্বিত তেমনি পুরাণ যে গ্রাম্য-সমাজে ধর্মীয় নয়, ধর্ম-নির্বিশেষে লোকজ উপকরণ তাও চমৎকার পরিস্ফুটিত হয়েছে এখানে।

Dhaka University Institutional Repository

'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের ভাষা পরিচর্যায় লেখক পরিশীলিত অভিজ্ঞতাকে কাজে না লাগিয়ে গ্রাম্য-অনুষঙ্গ ব্যবহার করে অধিকতর জীবন-ঘনিষ্ঠ করেছেন, গড়ে তুলেছেন ভাষার সামাজিক চরিত্র। সে-কারণে এ উপন্যাসে সমাজ, সমাজ-মানসের বর্ণনাই এসেছে, তার ফাঁকে ফাঁকে লেখক সামান্য প্রকৃতির অনুষঙ্গ এনেছেন বিষয় বা চরিত্রের প্রেক্ষাপটে। নিছক নিসর্গ-বর্ণনা এ উপন্যাসে সামান্য,তবে তাৎপর্যমণ্ডিত। যেমন –

> সে যখন কাসুকে কোলে করে নিয়ে যায়, তখন রোদের তেজ বেড়েছে। মাঠের আধা-পাকা মশুর, কলাই ও সর্ষের গাছে শিশির তখনও ঝলমল করছে।[৭৬]

প্রকৃতির এ বর্ণনা মূলত মায়ের সান্নিধ্যে ফিরে যাওয়া কাসুর 'ঝলমলে' মনকেই প্রতীকায়িত করেছে। বস্তুত, সমাজ ও জীবনের বহিরঙ্গকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করায় উপন্যাসে বহির্বাস্তবতাই এসেছে, চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতার সন্ধান পাওয়া যায় নি। তবে প্রকৃতির সামান্য ব্যবহারে লেখক কখনও কখনও চরিত্র-মানসকে প্রতীকায়িত করার চেষ্টা করেছেন। আরও একটি উদাহরণ –

> ধানক্ষেতের আল ধরে পথ চলে জয়গুন। হাঁটু সমান উঁচু ধান গাছে ভরা মাঠ। যেন সবুজ দরিয়া। ঝিরঝিরে বাতাস ঢেউ-এর নাচন তোলে। ছড়িয়ে দেয় মাঠের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। দূর-প্রসারী মাঠের দিকে তাকিয়ে জয়গুনের চোখ জুড়ায়।[৭৭]

'তোবা'র বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের পথে অগ্রসরমান জয়গুন মুক্ত প্রকৃতির মাঝে নতুন করে বাঁচার আশ্বাস খুঁজে পেয়েছে। জয়গুনের মনোজাগতিক-মুক্তিকে ব্যঞ্জনা দান করতে প্রকৃতির এই ব্যবহার অনবদ্য।

প্রখর জীবনবোধ, সুনির্দিষ্ট কাল পরিধি, বাস্তব জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতার সম্মিলিত শিল্পরূপ আবু ইসহাকের 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর পরই এ উপন্যাস বহু প্রশংসা ও বিরূপ সমালোচনা দুই লাভ করেছে। কোন কোন সমালোচকের দৃষ্টিতে 'ছকবাঁধা' উপন্যাস, কারো দৃষ্টিতে 'স্কেচধর্মী উপন্যাস' বলে মূল্যায়িত হয়েছে এ উপন্যাস। কেউ কেউ রীতিমতো প্রশ্ন তুলেছেন আলোচ্য উপন্যাসের শিল্পকুশলতা নিয়ে।

যুগের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর যেমন পরিবর্তন হয়, সমালোচনা বা উপন্যাস বিচারে কিছু কিছু পদ্ধতি বা মানদণ্ড পরিবর্তিত হয়েছে সত্য কিন্তু নবতর জীবন ব্যঞ্জনায় বাংলা কথাসাহিত্যের অসম্ভব শক্তিশালী এই উপন্যাসটির পূর্ণাঙ্গ যথার্থ মূল্যায়ন খুব একটা হয় নি। চিত্রশিল্পের Term 'স্কেচ' শব্দটি

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন ব্যবহৃত হয় – তখন তা ভিন্ন তাৎপর্য লাভ করে। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে 'সামাজিক নকশা' কে 'স্কেচ' বলে তাৎপর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' নিঃসন্দেহে 'কলিকাতা কমলালয়' কিংবা 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর মতো সামাজিক নকশা নয়। চিত্রশিল্পে 'স্কেচ' অভিধায়, রূপকে প্রান্ত রেখার নির্ভরতায় পরিস্ফুট করা হয়। তাতে অভিব্যক্তির বিশদ বৃত্তান্ত থাকে না। তা যখন রেখা ও রঙের প্রয়োগে বিস্তৃত ভাষ্য পায় তখন তাকে আর স্কেচধর্মী বলা যায় না। বর্তমানে সাহিত্যে 'স্কেচধর্মী' রচনা বলতে সে রচনাকে বোঝায় যাতে কোন বহির্কাঠামোকে রূপায়িত করা হয় মোটা দাগে এবং তাতে জীবনের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ, উপাদান থাকে না । 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে যে জীবনকে ধারণ করা হয়েছে সে-জীবনের অনুপুঙ্খ, বিস্তৃত বিবরণ আছে – সেক্ষেত্রে স্কেচধর্মী রচনা বলে আমরা এ উপন্যাসকে বিবেচন যথার্থ মনে করতে পারি না। মোক্ষম সংলাপ,বর্ণনার সুমিতায়ণ আর বক্তব্যপুষ্ট সংক্ষিপ্ত ভাষার উপকথা,প্রবাদ-প্রবচনের যে আবহ তৈরি হয়েছে এ সাহিত্যকর্মে এবং শাশ্বত বাংলার স্নেহার্দ্র মাতৃহৃদয়,নারীকুলের পারস্পরিক সম্পর্ক,ভাই-বোনের বন্ধন এবং এর সঙ্গে কলোনীকালের ঘটনার সংঘাত,এই দুই-য়ে মিলে উপন্যাসটি অবশ্যই উপন্যাস সুলভ ব্যাপ্তি লাভ করেছে। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনের পরিবর্তন আসে না, তাদেরকে জটিলতর পথে জীবনসংগ্রামী হতে হয়। ইংরেজকাল ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রযন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনের রূপ তথ্যনিষ্ঠতায় সত্যনিষ্ঠ করতে ঔপন্যাসিক ইসহাক পল্লবগ্রাহিতায় আকর্ষণ বোধ করেন নি,এমন ধারণা করা যেতে পারে না। বস্তুত রুশ উপন্যাসের বিশাল বিস্তৃতি বাংলা উপন্যাসে দুর্লভ – সে বিবেচনায় আবু ইসহাক যে শিল্পকুশলতায় বিস্তৃত জীবনকে ধারণ করেছেন – তা বিপুলায়তন না হলেও সফল। শিল্পকুশলতা নিয়ে উপন্যাসের যাথার্থ্যের প্রশ্নও পুনর্বিবেচনার দাবী জানায়। কেননা চিত্রানুগ হলেই উপন্যাস হিসেবে সার্থক না হবার কোন কারণ নেই বলেই আমাদের ধারণা। চিত্রানুগও যে বর্ণনার একটি কার্যকর পদ্ধতি তা আমরা পূর্বেই জেনেছি। শিল্পীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার মিশেল ঘটে নি বলে কথা উঠেছে। লেখকের অভিজ্ঞতায় নিরন্ন নারী চরিত্র, গ্রামের কুসংস্কার, বিভাগ-পূর্ব ও বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতার রূপায়ণ ঘটেছে এ উপন্যাসে কিন্তু লেখক তার জীবনের বিস্তৃতিতে পাওয়া অভিজ্ঞতা এবং তাঁর জীবনদর্শন একটি কাহিনীর অখণ্ডতায় উপস্থাপন করেছেন, যে চরিত্র এবং জীবন তিনি বর্ণনা করেছেন সে জীবনের বর্তমান তো বটেই অতীত ও ভবিষ্যতের সামগ্রিক চিত্র এঁকেছেন, কাহিনী-পরিপাটি বা 'স্টোরি প্যাটার্ন' রক্ষা করেছেন – তারপরও কি একে শিল্প বলে বিবেচনা করা যাবে না? আমরা বলব, উপন্যাসের কাহিনীতে শিথিলতা তেমন নেই। শফির মা'র

Dhaka University Institutional Repository

মুখের নানা গল্পকথা এই জীবন-অঙ্কনে অপরিহার্য, রমেশ ডাক্তারের উপকাহিনীও কাহিনীর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়, বরং লেখকের মানস-ধারণে বা সমকালীন দেশবিভাগ বাস্তবতায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তবে একটি ক্ষেত্রেই এ উপন্যাসে পরিপূর্ণতার অভাব ঘটেছে বলে আমাদের ধারণা। ঔপন্যাসিক চরিত্রের মনোজগতকে, তাদের দ্বন্দ্ব-সংকট এবং তা থেকে উত্তরণের অর্থাৎ আন্তর-বাস্তবতাকে প্রাধান্য দেন নি। জয়গুনের চরিত্রের দ্বন্দ্ব এসেছে তবে তা সীমিত আকারে। অন্যান্য চরিত্রের ক্ষেত্রে সেটাও পাওয়া যায় নি। যে কোন মানুষের বাইরের জগতের মতো অন্তর্জগতও গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির অধিক পরিচর্যায় চরিত্রগুলোর মন্ময়জগত আরও উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং তা হলে মানবজীবনের সত্য আরও অভিব্যক্তিমুখর হত।

'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক নিখুঁতভাবে দেশ-কাল-সমাজকে পর্যবেক্ষণ করে সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি বিরোধী এবং উদার কুসংস্কার-মুক্ত জীবন-সত্তাকে স্থাপন করেছেন চিরায়ত গ্রামীণ সমাজে। একজন সমালোচক খেদ প্রকাশ করে লিখেছেন –

> এই নদী, এই বৃষ্টি, এই বাতাস, এই পাহাড়, এই সমতল আর এই সমুদ্রকে অন্বিত করে যে-মানুষ সে তার নিজের বাঁচার কাহিনী নিয়ে আমাদের উপন্যাসে এল না ।[৭৮]

এ উপন্যাসে তো মানুষ তার বাঁচার কাহিনী নিয়েই এল; মানুষের জীবনে কত প্রতিবন্ধকতা এল, তাকে বিনাশ করতে চাইলো, তাকে ভেঙে ফেলতে চাইলো কিন্তু মানুষ তো তার জীবনের কাছে নতি স্বীকার করলো না; সর্বস্ব হারিয়েও নতুন আশায় নতুন করে বাঁচার প্রেরণায় নতুন পথে যাত্রা শুরু করল।

'সূর্য-দীঘল বাড়ী'-র আবেদন বাংলা সাহিত্যের পরিধি ছাপিয়ে বিদেশী ভাষাকেও অধিকার করেছে। চেক ও উর্দু ভাষায় 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' অনূদিত হয়েছে। প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ডক্টর দুসান বাবিতেল এটি চেক ভাষায় অনুবাদ করেন এবং ১৯৬২ সালে তা 'Zacarovany Dum' শিরোনামে চেকোস্লাভাকিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়। উর্দু অনুবাদ 'আসেবি ঘর' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমী থেকে। উপন্যাসটি অবলম্বনে নির্মিত মসিউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী পরিচালিত 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' ১৯৭৯ সালের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

পুরস্কার এবং বিভিন্ন বিভাগে আরও আটটি পুরস্কার লাভ করে। ১৯৮০ সালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসবে চলচ্চিত্রটি মোট ছয়টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পায়।

নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি সমাজ ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ার পটভূমিতে রচিত 'সূর্য-দীঘল বাড়ী ' উপন্যাসে আপাতদৃষ্টিতে এই ভাঙ্গা-গড়ার বিবরণ পাওয়া যায় না কিন্তু জয়গুনের জীবন-প্রবাহ উপন্যাসের সমাপ্তিতে যে একটি নতুন ইঙ্গিত দিয়েছে পরবর্তী সম্ভাবনার – ইতিবাচক বা নেতিবাচক যা-ই হোক না কেন – সেখানে সমাজের চলিষ্ণু চেহারা উঠে এসেছে। একটি সীমাবদ্ধ সময়ের পরিধিতে রচিত হলেও 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাস চিরায়ত বাংলার নিম্নবর্গীয় মানুষের বেদনা ও বিক্ষোভ, সংকট ও সংকল্পের তাৎপর্যপূর্ণ দলিল।

সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে জয়গুনের বিকাশসাধনই এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য। এ উপন্যাসে উন্মুলিত জয়গুনের অস্তিত্ব রক্ষার সুতীব্র সংগ্রামের কাহিনীর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক সমকালীন সমাজবাস্তবতাকে চিত্রিত করেছেন। এ বিবেচনায় বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী উপন্যাস হিসেবে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র সফলতা স্বীকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পদ্মার পলিদ্বীপ

মধ্যযুগীয় সামন্তবাদের বিনাশে এবং ব্যক্তি-মানুষের উত্থানে সৃষ্ট হয় উপন্যাস। সমাজ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চুলচেরা বিশ্লেষণে উপন্যাসে আসে সমাজবাস্তবতা। ব্যক্তির অন্তর্গত দ্বন্দ্ব, সময় ও সমাজের অভিক্ষেপ উপন্যাসের কাঠামোকে করে তোলে বহুমাত্রিক। আধুনিক মানুষের জীবন-ধারণ, সমস্যা-সংঘাত, আশা-আকাঙ্ক্ষা-হতাশার সার্থক প্রতিফলন ঘটে আধুনিক উপন্যাসে। সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাংলাদেশের উপন্যাস মূলত গ্রামজীবন কেন্দ্রিক – যুগ-যুগান্তরের নিপীড়িত-নির্যাতিত গ্রামীণ মানুষের টিকে থাকার সংগ্রামই উপজীব্য হয়েছে এ সময়ের উপন্যাসে। সাতচল্লিশোত্তর বাংলা উপন্যাসের ধারায় আবির্ভাব ঘটে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭০), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-১৯৭১), শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭) প্রমুখ ঔপন্যাসিকের। গ্রামীণ-বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে সমাজ ও সময়ের দাবি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে তাঁরা নির্মাণ করেছেন অসাধারণ কিছু উপন্যাস। এ ধারারই একজন সফল ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক – 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' ও 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাসদ্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপন্যাস ধারাকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন।

নদী-মাতৃক বাংলাদেশের নদী ও নদীকেন্দ্রিক জীবন নিয়ে বেশ কিছু চমৎকার উপন্যাস রচিত হয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদের 'নদী বক্ষে'(১৯১৯), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে 'পদ্মা নদীর মাঝি '(১৯৩৬), অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম'(১৯৫৬), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র 'কাঁদো নদী কাঁদো '(১৯৬৫), উপন্যাসসমূহ তার দৃষ্টান্ত। নদী-নির্ভর বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'পদ্মার পলিদ্বীপ'। এ উপন্যাসের ষোলটি অধ্যায় 'মুখর মাটি' নামে বাংলা একাডেমীর সাহিত্য-সাময়িকী 'উত্তরাধিকার'(মে ১৯৭৪ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬)-এ প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটির রচনা শুরু হয় ১৯৬০ সালে, দীর্ঘ-বিরতির পর লেখক ১৯৮৪ সালে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে এটি সমাপ্ত করেন। উপন্যাসটি 'মুক্তধারা' কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় এপ্রিল, ১৯৮৬ সালে।

Dhaka University Institutional Repository

এটি কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাকের দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রথম উপন্যাস 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র ন্যায় বৃহত্তর গ্রামীণ সমাজ এ উপন্যাসের পটভূমি না হলেও বিরূপ প্রতিবেশে দ্বন্দ্বমুখর সংগ্রামী-জীবন এ উপন্যাসেরও উপজীব্য। পদ্মার পলিবাহিত দ্বীপ বা চরে ভাঙ্গা-গড়ার দোলাচলে সংগ্রামশীল মানুষের জীবনাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে এ উপন্যাসের কাহিনী-কাঠামোতে। দুর্দমনীয় পদ্মা প্রতিনিয়ত গ্রাস করে চলেছে তার তীরবর্তী ভূমিকে – এবং এই ভূমি-ভাঙ্গা-পলল কালের প্রবাহে সঞ্চিত হয়ে পদ্মার বুকে নতুন চরের সৃষ্টি করেছে আবার তা ভেঙ্গেও যাচ্ছে। ভূমি-কেন্দ্রিক এই পূর্ববাংলার জন-জীবনে পদ্মার চরের ভাঙ্গন-গড়ন যে স্বপ্ন এবং স্বপ্ন-ভঙ্গের বেদনা সৃষ্টি করেছে ঔপন্যাসিক তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ধারণ করে শিল্পে প্রয়োগ করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, আবু ইসহাকের জন্ম ফরিদপুর জেলায় (বর্তমানে শরীয়তপুর) এবং পদ্মার ভাঙ্গা-গড়ার খেলা বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় দীর্ঘকাল ধরে (এমনকি বর্তমানেও) ক্রিয়াশীল। ফরিদপুরের অধিকাংশ ভূমিই পদ্মানদী-জাত চর। এ অঞ্চলে চর ও মূলভূমির মানুষের মধ্যকার জীবন-যাপন বা সামাজিক কৌলিন্যের পার্থক্য এখনও সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় নি। ঔপন্যাসিক আশৈশব চর-ভাঙ্গা ভূমিহীন মানুষ, তাদের বাঁচার সংগ্রাম, নতুন চর জাগলে তা দখলের উন্মাদনা প্রভৃতি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন খুব কাছ থেকে এবং অসাধারণ শৈলী ও বিন্যাসে গ্রথিত করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের অভিমত স্মরণীয় –

> পদ্মার পলিদ্বীপে চিত্রিত হয়েছে পদ্মার চরাঞ্চলের জীবন , এই জীবনের সঙ্গে আবু ইসহাক ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। [৭৯]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল সময় প্রবাহে এক বৎসরাধিক কাল পরিসরে পদ্মার বুকে নবজাগ্রত একটি চরকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় চরিত্র ফজলের জীবন-সংগ্রামই এ উপন্যাসের মূল ঘটনাংশ। বিশ্বযুদ্ধের উত্তেজনা ও উত্তাপ কেন্দ্রীয় ঘটনাংশে প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষভাবে বিস্তারমান। উপন্যাসের প্রথম পর্বেই পদ্মা নদীতে রাত্রির শেষ প্রহরে ফজলের মাছ ধরার মধ্য দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত। 'গত তিনবছর ধরেই টানাটানি' চলা সংসারে সামান্য স্বস্তি যোগাতে ফজলের মাছ ধরার নেশা কি করে পেশায় পরিণত হলো সে স্মৃতিচারণে এরফান মাতবরের অতীত ও বর্তমান এবং সে-সূত্রে চরের বসতির ক্ষণস্থায়িত্ব বর্ণিত –

> চরের বসত আজ আছে, কাল নেই। নদীর খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করে করে চরের আয়ু। তার খুশিতে চর জাগে। তারই খেয়ালে ভেঙ্গে যায় আবার। এ যেন পানি আর মাটির চুক্তি । চুক্তি অনুযায়ী পাঁচ, দশ, বিশ বছরের মেয়াদে বুকের ওপর ঠাঁই দেয় পানি। মেয়াদ

Dhaka University Institutional Repository

> ফুরালেই আবার ভেঙ্গেচুরে নিজের জঠরে টেনে নেয়। চরবাসীরা তাই স্থায়ী হয়ে বসতে পারে না কোনো দিন। তাদের বাপ-দাদার ভিটে বলতে কিছু নেই। বাপ-দাদার কবরে চেরাগ জ্বালাবার প্রয়োজন হয় না তাদের কোনো দিন। ফজলের বাবা এরফান মাতব্বর প্রায়ই একটা কথা বলে থাকে, 'চরের বাড়ি মাটির হাঁড়ি, আয়ু তার দিন চারি।[৮০]

গৃহস্থের ছেলে হয়েও মাছ বিক্রির মধ্য দিয়ে একদিকে বিশ্বযুদ্ধকালীন গ্রামীণ-মানুষের দুর্দশা, অন্যদিকে ফজলের সংস্কার-মুক্তির প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। গ্রামীণ সমাজে গৃহস্থরা জেলেদের অপেক্ষা অধিক সম্মানধারী সুতরাং অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর; তাদের জন্য নিম্নশ্রেণীর বৃত্তি অবলম্বন যথেষ্ট নিন্দনীয়। সামাজিক নিন্দাকে অগ্রাহ্য করে ফজলের এগিয়ে যাওয়া নতুন দিনের ইঙ্গিত বহন করে এবং তার 'খুনের চর' আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে নতুন আশার ইঙ্গিত আরও শক্ত ভিত্তি পায়। মূলত প্রথম পর্বেই ঔপন্যাসিক সমগ্র কাহিনীর সংহতরূপের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে খুনের চরের পূর্বতন মর্মান্তিক ইতিহাস বর্ণনের মধ্য দিয়ে চিরকালীন লড়াইয়ের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে –

> দশ বছর আগে একবার জেগেছিল এ চর। তখন নাম ছিল লটাবনিয়া। এ চরের দখল নিয়ে মারামারি হয়েছিল দুই দলে। দুই দলের দুই প্রধান ছিল এরফান মাতব্বর আর চেরাগ আলী সরদার। দুই দলের পাঁচজন খুন হয়েছিল। এরফান মাতব্বরের দলের দুজন আর চেরাগ আলীর দলের তিনজন। এরপর থেকেই লোকের মুখে মুখে লটাবনিয়ার নাম হয়ে যায় খুনের চর।
>
> এরফান মাতব্বরের বড় ছেলে রশিদ চরের এ মারামারিতে খুন হয়েছিল।[৮১]

ভূমি অস্থায়ী হলেও পলল-উর্বর চর দখলের এই প্রক্রিয়া বাংলার আবহমানকালের। ঔপন্যাসিক অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম'(১৯৪৯) উপন্যাসের প্রথম পংক্তিতেই পাওয়া যায় –'চর তো নয়, – দুধের সর।' অসম্ভব উর্বর চরভূমি কৃষিজীবী বাংলায় স্বর্ণের মতোই মূল্যবান বলে বিবেচিত। বাঁচার তাগিদ এবং বসতি গড়ার আকাঙ্ক্ষাতেই কেবল নয়, চর-দখলের এই উন্মাদনার মধ্যেও কাজ করে সামন্তপ্রভুদের নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধির লালসা, স্বর্ণ-সম ভূমিকে আত্মসাৎ করার স্পৃহা। বস্তুত পদ্মা-তীরবর্তী অঞ্চলের লোকায়ত মানুষের জীবনাভিজ্ঞতায় নতুন নতুন চর জাগা এবং সেই চরকে ঘিরে নানা দল-উপদলের লড়াই একান্তই স্বাভাবিক ঘটনা। লড়াই করে বেঁচে থাকাই যাদের কাজ,তাদের

Dhaka University Institutional Repository

জীবনে এ অভিজ্ঞতা নতুন নয়, তাই তো আটিগাঁর পাঞ্জু বয়াতীর গান এ অঞ্চলে ' আপ্তবাক্যের মর্যাদা লাভ করেছে' –

লাঠের জোরে মাটিরে ভাই
লাঠির জোরে মাটি,
লাঠালাঠি কাটাকাটি,
আদালতে হাঁটাহাঁটি,
এই না হলে চরের মাটি
হয় কবে খাঁটি... রে।[৮২]

লড়াই না করে, রক্ত না দিয়ে কোনকিছু পাবার অভিজ্ঞতা এদের জীবনে অবান্তর, তাই তার প্রত্যাশাও অদৃশ্য বরং শৌর্য-বীর্য-জোর দিয়েই জীবনের সব প্রাপ্যকে আদায় করে নিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ এ অঞ্চলের অধিবাসীরা।

তৃতীয় পর্বে চর দখলের প্রস্তুতির প্রাক্কালে ফ্ল্যাশব্যাকে এরফান মাতব্বরের তথা ফজলের পারিবারিক বৃত্তান্তে রশীদের সন্তান নুরু ও তার বিধবা স্ত্রী হাজেরার কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে ফজলের স্ত্রী রূপজানের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এভাবে প্রত্যেকের পরিচয় জানায় কাহিনীর বুনন মজবুত হয়। অন্যান্য মাতব্বর ও শরীকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে নতুন চর দখলের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক ঘটনার সূত্রপাত করেছেন। চর-দখলের মধ্য দিয়ে যেখানে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটতে পারতো, সেখানে মূল ঘটনার সূচনা হয় চতুর্থ পর্বে প্রবল-প্রতাপশালী প্রতিপক্ষ জঙ্গুরুল্লার আবির্ভাবে। নতুন সামন্ত জঙ্গুরুল্লার উত্থান-পর্ব, তার দুর্বলতা এবং সেই দুর্বলতার উত্তাপে ক্রমশ সবল হয়ে ওঠার কাহিনীর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক ভূমি প্রত্যাশী মানুষদের এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ তৈরি করেছেন। বেশ কয়েকটি চরের দখল পেয়ে এই প্রতিপক্ষ খুনের চর দখলের বাসনায় কৌশল ও চক্রান্তের জাল বিস্তার করে।

যে চর পুরোপুরি জেগে ওঠে নি তখনও, কেবল ভাটার সময় কোনো কোনো অংশ জাগে এবং জোয়ারে আবার ডুবে যায় – সে চরেই জলমগ্ন মৃত্তিকার শক্ত ভিত্তিতে বাঁশের খুঁটি গেড়ে জলের ওপর নির্মাণ করা হয় 'ভাওর ঘর'। এক টুকরো জমির আশায় কৃষি-নির্ভর স্থলবাসী জলচর জীবনেও আপত্তি জানায় না, পলল-উর্বর আধ-জাগা ভূমিতেই রোপণ করে 'বোরো ধানের রোয়া' তথা সুখ-স্বপ্ন-সমৃদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

আশার বীজ। সে আশা দুরাশায় পরিণত হবার আশঙ্কায় তারা সর্বদাই থাকে সন্ত্রস্ত, পাহারারত। জঙ্গুরুল্লার দুরভিসন্ধির সংবাদ পেয়ে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে এরফান মাতব্বর আমদানী করে চর-দখলের প্রত্যক্ষ উপাদান পেশাদার লাঠিয়াল বা 'চাকরিয়া' । একশ' উনত্রিশ জন 'চাকরিয়া' পুষতে গিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়ে তারা। সুতরাং খরচ বাঁচাতে বিদায় করতে বাধ্য হয় অধিকাংশ লাঠিয়ালকে। এ সুযোগেরই অপেক্ষায় অপেক্ষমান জঙ্গুরুল্লা মিথ্যে ডাকাতির মামলা সাজিয়ে পুলিশের সহায়তায় বিনা রক্তপাতে দখল করে নেয় খুনের চর – উপন্যাসের তেরোতম পর্বে।

উপন্যাসের চরম-উৎকর্ষ বা 'Climax' ঘটে চৌদ্দতম পর্বে ফজলের শ্বশুর আরশেদ মোল্লা ও জঙ্গুরুল্লার মিলিত কারসাজিতে ডাকাতির মামলায় ফজলের গ্রেফতার হবার মধ্য দিয়ে। একদিকে চর হারাবার ক্ষোভ ও অপমান, অন্যদিকে পুত্রের দুরবস্থা অসুস্থ এরফান মাতব্বরের জীবন-প্রদীপ নিভিয়ে দেয়। বিনাদোষে হাজতে থাকার সময় রাজনৈতিক বন্দীদের সংস্পর্শে এসে ফজল লাভ করে নতুন উদ্দীপনা। সময়-সমকাল ও স্বদেশ সম্পর্কিত ভাবনার জাগরণ ঘটে তার মনোজগতে। রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে জেল থেকে পালানো তার নব সংস্পর্শকে দীর্ঘায়িত করে, পরে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে ফজল লঘু দণ্ড প্রাপ্ত হয়। জেলের অবকাশে চর-দখলের নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে পরবর্তী সময়ে জেল-মুক্ত ফজল বিনা রক্তপাতে পুনর্দখল করে খুনের চর।

আপাত দৃষ্টিতে চর দখল-পুনর্দখলের কাহিনী 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে ঔপন্যাসিককের উদ্দিষ্ট বিষয় হল চরাঞ্চলীয় ছিন্নমূল মানুষের সামগ্রিক জীবন। এ কারণেই চর দখলের ঠাস বুনন কাহিনীর ভেতরও সঞ্চারিত হয়েছে জরিনা-ফজল-রূপজানের ত্রিমুখী সম্পর্কের মিষ্টি উপাখ্যান। এ ঘটনাংশ মূল কাহিনীর সমান্তরাল নয় বরং অনিবার্য অংশ বলেই বিবেচিত। এ অঞ্চলের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জৈবিক বাসনার স্ফুরণ, মনোজাগতিক দ্বন্দ্ব, এমনকি খাদ্যাভ্যাস বা বিভিন্ন লোকাচারও রূপজান-ফজল-জরিনার কাহিনীসূত্রে বিকশিত হয়েছে। তবে উপন্যাসের শেষাংশে আরশেদ মোল্লার পূর্বোপাখ্যানে জন ল্যাম্বার্টের সহৃদয়তার কাহিনী বর্ণনা এবং পুনরায় তার সাহায্য লাভ করার ব্যাপারটি নদী-তীরবর্তী জীবন-সংগ্রামে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পুলিশ অফিসারের সততায় জঙ্গুরুল্লার পরাজয় এবং শাস্তি লাভও বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, বরং তার বিপরীতই সমাজ-সত্য বলে স্বীকৃত। কিছু অতিরিক্ত কাহিনীর সংযোজন উপন্যাসের প্লটকে দুর্বল করে দেয় সত্য, তবে সামগ্রিক বিচারে একটি নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে একটি আঞ্চলিক জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

চিরায়ত রূপ এবং একই সঙ্গে নতুন রাজনৈতিক প্রতিবেশে সে-জীবনে চিরন্তনের সমান্তরালে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় 'পদ্মার পলিদ্বীপ'। কাহিনীর সংঘটনে ঔপন্যাসিকের দক্ষতার ছাপ স্পষ্ট।

একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন-জীবনের শিল্প-ভাষ্য 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাস বা 'Regional Novel' হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রসঙ্গত আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিম্নে কয়েকজনের মত উদ্ধৃত হল –

> ক. একটি স্বয়ং স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ অঞ্চলের আপাত সত্যকাহিনীই হচ্ছে আঞ্চলিক উপন্যাসের কাহিনী। এ রীতির উপন্যাসে নির্মিত জীবনদর্শন, ভাষা, সংলাপ, ঘটনা, চরিত্র সবকিছুই একটি নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ভাব ও আবহকে উপস্থাপন করে।[৮৩]

> খ. আঞ্চলিক কথাসাহিত্যে বিশেষ কোন অঞ্চল বা জেলার স্থানীয় পরিবেশ কিংবা সেখানকার অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার বা জীবনচর্চার খুঁটিনাটিরূপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে ওই অঞ্চলের একটি বিশিষ্টরূপ 'স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব' নিয়ে জেগে ওঠে।[৮৪]

> গ. এই জাতীয় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হইল, অপরিচয়ের রহস্যমণ্ডিত সুদূর ভৌগোলিক ব্যবধানে অবস্থিত কোন অঞ্চলের বিশিষ্ট জনপ্রকৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মবিশ্বাসসংস্কারের ব্যাপক চিত্রাঙ্কন, অথবা কোন বিশেষ ধরনের বৃত্তিজীবীগোষ্ঠীর বিশিষ্ট জীবনবোধের পরিস্ফুটন।[৮৫]

এ বিষয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিকদের প্রদত্ত ভাষ্য নিম্নরূপ –

> ক. The Regional novel emphasizes the setting, speech, and the social structure and customs of particular locality, not merely as local color, but as important conditions affecting the temperament of the charaters and their ways of thinking, feeling and interacting...[৮৬]

> খ. A quality in literature which is the product of its fidelity to a particular geographical section, accurately, representing its habits, speech, manners, history, folklore, or beliefs.[৮৭]

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত মতসমূহ বিশ্লেষণে আঞ্চলিক উপন্যাসের যে বৈশিষ্ট্যাবলি নিরূপিত হয়েছে তার প্রায় সবগুলোই 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাসে বিদ্যমান। প্রথমত, উপন্যাসের কাহিনী একটি বিশেষ অঞ্চলের কাহিনী – বাংলার সমগ্র গ্রামাঞ্চলের জীবন এতে স্থান পায় নি, কেবল পদ্মানদীর চরাঞ্চলীয় মানুষের কাহিনীই এর উপজীব্য।

দ্বিতীয়তঃ চরের ভাঙ্গা-গড়ার দোলাচলে সংগ্রামী মানুষের যে জীবনচিত্র ঔপন্যাসিক অঙ্কন করেছেন, সে জীবন-সংশ্লিষ্ট ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস সমস্তই নির্দিষ্ট অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাবদ্বারা নির্মিত।

এ সমস্ত বিবেচনায় আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাসের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত।

অবশ্য বত্রিশ পর্বে বিন্যস্ত এ উপন্যাসকে ফর্মের দিক থেকে এপিকধর্মী উপন্যাস বলেও অভিমত প্রকাশ করেছেন কয়েকজন সমালোচক।[৮৮] জীবনের পরিব্যাপ্ত সময় এবং ব্যাপমান সমাজের সামূহিক (Collective) অভিজ্ঞতা থেকে এপিক ফর্মের জন্ম হয়। Epic একটি সমাজের উত্থানপর্বের আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের শিল্পনির্মাণ। 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাসের কাহিনীকাল প্রায় এক বৎসর হলেও যে জীবনের প্রবাহ এখানে বর্ণিত তা আবহমান ইতিহাস-পরম্পরায় যাপিত। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ফজলের জীবনের দুর্বিপাকের কারণ চরের ভাঙন। আবার নতুন চরের দখল নিতে নিজস্ব চিন্তা - চেতনা-কৌশলের পাশাপাশি সে তার বাবা এরফান মাতবরের আদর্শকেও স্মরণ করে চলেছে –

> আর শোন, তোমাগ সব্বাইরে স্মরণ করাইয়া দিতেছি – বা'জান কি কইত, মনে আছে তো ? এইডা কিন্ত রাজা-বাদশাগ লড়াই না যে যারে পাইলাম তারে খতম করলাম। এই লড়াই অইল বিপক্ষেরে খেদানোর লেইগ্যা।[৮৯]

হয়ত ফজলের সন্তানও ধারণ করবে একই প্রত্যয়। এরফান মাতবর, ফজল এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম চরের ক্ষণস্থায়ী মাটিতে বংশ-পরম্পরায় গড়ে তুলেছে এবং তুলবে অস্থায়ী আবাস – আবার নতুন চর জাগলে নতুন আবাস নির্মাণ করবে শক্তি-সামর্থ্য-বুদ্ধি দিয়ে। চর-কেন্দ্রিক এই আবহমান জীবন-তরঙ্গ ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনদর্শন সমন্বিত হয়ে সামগ্রিক জীবনবাস্তবতাকে ধারণ করেছে এ উপন্যাস এবং ফর্মের দিক থেকে তা এপিকধর্মিতার পরিচয় বহন করছে।

সময়-সংক্রান্ত অনুভব উপন্যাসের কাহিনীর সূত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। চর দখল-পুর্নদখলের আবহমান পরম্পরা ঘটনাংশ হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা, জাপানীদের আগ্রাসন ঠেকাতে বৃটিশ সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

মরিয়া তৎপরতা, উপমহাদেশীয় রাজনীতিবিদদের কার্যক্রম প্রভৃতির উল্লেখ কাহিনীতে সময় অনিবার্যতার সৃষ্টি করেছে। চরাঞ্চলের মানুষ হলেও ফজল, জরিনা ও অন্যান্যের প্রাত্যহিকতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী হিংস্রতা বিদ্যমান। নদীমাতৃক বাংলায় যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম নৌকা। যুদ্ধকালে যাতে এই বাহন অতিদ্রুত পেতে পারে বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সমস্ত নৌকা পুড়িয়ে পালাতে পারে – সেজন্য নৌ-শুমারি করেছে ইংরেজ সরকার। নম্বর লাগিয়ে মালিককে নৌকা ফেরত দিয়েছে আবার নামমাত্র মূল্যে সাধারণ মানুষের নৌকা কিনেও নিয়েছে জোর করে। এ ব্যাপারটি কাহিনীসূত্রে গ্রথিত করেছেন ঔপন্যাসিক চমৎকারভাবে –

> মেহের মুনশি ফতেগঞ্জ গিয়েছিল। দেশের সব জায়গা থেকেই নৌকা আটক করা হয়েছে। হাজার হাজার নৌকার ভেতর থেকে সে ফজলদের পানসিটা খুঁজে বার করতে পারে নি। ঘাসিটা সরকার কিনে নিতে চেয়েছিল। দাম ধার্য হয়েছিল মাত্র একশ' টাকা। তিরিশ টাকা বোট ইন্সপেক্টরকে ঘুস দিয়ে ওটায় নম্বর লাগিয়ে ফেরত আনা হয়েছে।[৯০]

নৌ চলাচলের উপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করা ও এক জেলার চাল অন্য জেলায় বহনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা – এ সবই জাপানী আগ্রাসন ঠেকাবার জন্য বৃটিশদের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। কিন্তু সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ তাতে চরমে উঠেছে। যুদ্ধের প্রভাবে চালের দাম বেড়েছে বহু গুণ। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কাছে চাল 'রূপার দানা'র মতো দুর্মূল্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরির জন্য বানপুর টাটানগরে বহু শ্রমিকের যোগদান প্রভৃতি প্রসঙ্গ যুদ্ধকালীন উত্তাপ সৃষ্টি করেছে মূল ঘটনাংশে। তাছাড়া চর-দখলের লড়াইয়ের ক্ষুদ্র প্রেক্ষাপটে বিশ্বের বৃহৎ লড়াইকে দেখার প্রচেষ্টাও শিল্পসম্মত রূপে প্রকাশিত হয়েছে সংলাপ বিনিময়-সূত্রে –

> –'এত সৈন্য যায় কই, হুজুর।' কেরামত জিজ্ঞাসা করে।
>
> –যায় লড়াই করতে। আমরা যেমুন চর দখলের লেইগ্যা বিপক্ষের লগে মারামারি করি, ওরাও তেমুন যাইতেছে বিপক্ষের লগে লড়াই করতে।[৯১]

জঙ্গুরুল্লার এ উক্তিতে বিশ্বনেতৃবৃন্দের মানসিকতাও চিহ্নিত । বস্তুত বিশ্বযুদ্ধ তো দখল-স্বত্ব কায়েমেরই যুদ্ধ। প্রাণের দায়ে নয়, জঙ্গুরুল্লা যেমন ক্ষমতা জোরদার করতে বা লোভের বশে চর দখল করতে লড়াই করেছে, তেমনি বৃহৎ পরিসরে বিশ্বযুদ্ধও ব্যক্তি বিশেষের ক্ষমতা বা লোভেরই প্রত্যক্ষ ফল। এ বিচারে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনাংশের সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধের তুলনামূলক বিচার সময়ের ঐক্যকে সংহত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পদ্মার পলল জাত-ভূমি নির্ভর মানুষের জীবন প্রবাহের অনুপুঙ্খ বিবরণ দেবার প্রচেষ্টা দেখা যায় 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাসের বিস্তৃত কলেবরে। উপন্যাসে আবু ইসহাকের মমত্ব ও সচেতন মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে নিম্নবর্গীয় মানুষ ও তাদের দুর্বিষহ বাস্তবতা। চর দখল পুনর্দখলের ফাঁকে যখনই সুযোগ পেয়েছেন ঔপন্যাসিক নিরন্ন, ভূমিহীন মানুষের দুর্দশা চিত্র বর্ণনা করেছেন পরম মমতায়। ঔপন্যাসিকের ভাষায় চর-ভাঙ্গা মানুষের জীবন এরূপ –

> চর ধানকুনিয়া পদ্মার জঠরে বিলীন হয়ে গেছে গত বর্ষার সময়। সেখানে বাইশ ঘর কোলশরিকের বসত ছিল। চরভাঙ্গা ভূমিহীন আর সব মানুষের মতোই তারা ভেসে যায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। কয়েকজন বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে আসাম চলে গেছে। সেখানে জঙ্গল সাফ করে জমি আবাদ করলেই নাকি জমির মালিক হওয়া যায়। কয়েকজন পুরনো কাঁথা-কাপড়, হাঁড়ি-পাতিল, গাঁটরি-বোচকা বেঁধে পরিবারসহ চলে গেছে শহরে। চরভাঙ্গা এ সব মানুষের দিনের আশ্রয় রাস্তার বট-পাকুড় গাছের তলা আর রাতের আশ্রয় অফিস-আদালতের বারান্দা। যাদের সামান্য কিছু জমা টাকা আছে তারা কষ্টে-সৃষ্টে ঝুপড়ি বেঁধে নেয় বস্তি এলাকায়। পুরুষেরা কুলি-মজুরের কাজ পেলে করে, না পেলে শুয়ে বসে কাটিয়ে দেয় সারাদিন। বউ-ছেলে-মেয়ে চাকুরে-ব্যবসায়ীদের বাসা বাড়িতে ঝি চাকরের কাজ জুটিয়ে নেয়। এমনি করে খেয়ে না-খেয়ে শাক-পাতা অখাদ্য-কুখাদ্য পেটে জামিন দিয়ে এরা দিন গোনে, রাত গোনে। এরা চাষের কাজে, ফসল উৎপাদনের কাজে আর কোনো দিন ফিরে আসে না চরের মাটিতে। ইচ্ছে থাকলেও আসতে পারে না আর। জমি পেতে হলে সেলামি দিতে হয়। কিন্তু সেলামির টাকা সারা জীবনেও কেউ যোগাড় করতে পারে না।[৯২]

সেলামি দেবার প্রসঙ্গেই নিম্নবর্গের সঙ্গে সঙ্গে উত্থাপিত হয় আরেক শ্রেণীর – যারা প্রকৃতির দান করা ভূমি অর্থ ও লাঠির জোরে দখল করে গড়ে তোলে বিত্ত-বৈভব। এ উপন্যাসের খল-চরিত্র জঙ্গুরুল্লাকে ঔপন্যাসিক শোষক চরিত্র হিসেবে নির্মাণ করেছেন সত্য কিন্তু মূল শোষক জমিদার নায়েবেরা, তারাই যে শিকস্তি পয়স্তির হিসেবে আজীবন ভোগ করে চরের খাজনা এবং তার দায় মেটাতে হয় ভূমি-প্রত্যাশী কৃষিজীবী মানুষকে তার বিবরণ দিতেও ভুল করেননি লেখক।

সমাজবিজ্ঞানী আন্দ্রে বেঁতেইসহ আরো অনেকের মতে ভারতীয় উপমহাদেশে (বাংলা অঞ্চল তো বটেই) অদৃশ্য ক্ষমতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হল ভূমি।[৯৩] ভূমি-নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় যে জমির মালিকেরা চিরকালই অন্যের ওপর শোষণের দণ্ড স্থাপন করেছে – এ উপন্যাসেও সে-সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

সত্য রূপায়িত হয়েছে। যুদ্ধের প্রেক্ষিতে নবোদ্ভূত শোষক চরিত্রের পরিচয়ও এ উপন্যাসে বিধৃত। ভূমি বিচ্ছিন্ন মানুষেরা শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিল টাটানগরে কিন্তু সর্দার দালালদের দুইশ রুপিয়া না দিয়ে সে-কাজে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয়নি অনেকেরই। ভূমিনির্ভর সামন্ত সমাজের শোষক যেমন জমিদার ও তার নায়েবরা, তেমনি পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সমাজের শোষক সর্দার, দালাল এবং মহাজন। এ উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্র হেকমত সমস্ত জীবন মহাজনের ঋণ শোধ করতেই চুরি করে বেড়ায় – তবুও সে ঋণ অপরিশোধ্যই থেকে যায়। পালিয়ে বাঁচতে পারে না, পোষা গুণ্ডা দিয়ে ধরে নিয়ে তার উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। সমাজের প্রতিটি স্তরেই যে নানারূপে শোষক প্রতিভূ বিদ্যমান হেকমতের মহাজন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বাত্মক চিত্রই কেবল নয়, অস্থায়ী ভূমির বাসিন্দা চরুয়াদের সঙ্গে স্থায়ী ভূমির আসুলীর ভালমানুষদের সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাও এ উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে বিভিন্ন স্থানে। চরের দু'দিনের বসতিতে নিরন্তর সংগ্রাম-রত চরের লোকজন শিক্ষা-দীক্ষা এবং আচার সংস্কৃতিতে চিরকালই অনগ্রসর এবং সে-কারণে গভীর হীনমন্যতাতে আক্রান্ত। আসুলীদের সঙ্গে তারা সকল সময়ই এক অলিখিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। হা-ডু-ডু খেলার বিস্তৃত বয়ানে সে প্রতিযোগিতার স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে । ভাটি অঞ্চলের মানুষেরা মনে মনে উজান-অঞ্চলের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে বহু 'শাচক' এবং দেন-দরবারের বিনিময়ে আসুলীর ভাল মানুষদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের কৌলিন্য বৃদ্ধির চেষ্টায় রত। এ উপন্যাসের এরফান মাতবর তেমনি উদ্দেশ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র রশীদের সঙ্গে মুলফতগঞ্জের শরাফত দেওয়ানের কন্যা হাজেরার বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেন তিনশ একটাকা এবং পাঁচ ভরি স্বর্ণের বিনিময়ে । পুত্রের মৃত্যুর পর পুত্রবধূর অন্যত্র আবার বিয়ে হলেও এরফান মাতবর দীর্ঘদিন পরেও তাকে ভুলতে পারেন না, তার স্মৃতিতে পুত্রবধূর তথা আসুলির শ্রেষ্ঠত্ব বর্তমানেও বিদ্যমান –

> আসুলির ভাল মাইনষের ঘরের মেয়ে ক'টা বছরের জন্য এসে মাতব্বর বাড়িতে রান্নার ধরনটাই বদলে দিয়ে গেছে। হাজেরা এ বাড়িতে বউ হয়ে আসার পর বরুবিবি তার হাতেই রসুইঘরের ভার ছেড়ে দিয়েছিল। হাজেরা বাপের বাড়ি নাইয়র গেলে মুশকিল বেঁধে যেত। স্ত্রীর হাতের রান্না খেয়ে মাতব্বর মুখ বিকৃত করে বলত, 'নাগো, ভাল মাইনষের মাইয়ার রান্দা খাইতে খাইতে জিব্বাডাও ভাল মানুষ অইয়া গেছে। তোমাগ আতের ফ্যাজাগোজা

Dhaka University Institutional Repository

আর ভাল লাগে না।' নিরুপায় হয়ে বরুবিবিকে শেষে পুতের বউর কাছে রান্না শিখতে হয়েছিল।[৯৪]

নব্য ধনী জঙ্গুরুল্লাও মান বৃদ্ধির প্রয়াসে তৃতীয় পুত্র জহীরের বিবাহ প্রস্তাব প্রেরণ করে উত্তর পাড়ের ভাটপাড়া গ্রামের কাজী বাড়িতে যদিও তা অপমানের সঙ্গে অগ্রাহ্য হয়।

পদ্মাতীরের সংগ্রামী জনজীবনে ধর্ম ও কুসংস্কার ততটা জেঁকে বসতে পারেনি – অন্তত এ উপন্যাসে তা দৃশ্যমান নয়। সম্ভবত নিবাস অস্থায়ী বলেই বা জীবন যাপন অতিমাত্রায় দুঃসহ বলেই কুসংস্কারের ঘোর তমসা আচ্ছন্ন করতে পারেনি তাদের সর্বাঙ্গীণ জীবন; তবুও ধর্মভীরু তারা, অন্ধ আবেগ ও বিশ্বাসে ধর্মে প্রচলিত রীতি-নীতিতে আস্থাবান। কোরান পাঠরত এরফান মাতবর মারফতি গানের সুরে আকৃষ্ট হলে নিজেকে অপরাধী ভাবে। দুর্ধর্ষ জোতদার জঙ্গুরুল্লা পীর সাহেবকে সন্তুষ্ট করে বসত করাতে চায় চরের ভূমিতে এ বিশ্বাসে যে, পীরের স্থিতি চরভাঙ্গা রোধ করবে। গোরা সৈন্য কর্তৃক অপহৃত গ্রাম্য-বধূ সবুরণ দু'দিন পরে ফিরে এলে তার গায়ের সুগন্ধ সকলের মনে এ বিশ্বাস জন্মায় যে, সে জিন কর্তৃক অপহৃত হয়েছিল এবং জিন-পরীর দেশ কোহ্কাফে ঘুরে এসেছে। প্রত্যক্ষদর্শী ফজল অবশ্য এ ঘটনা-বিশ্লেষণে লাভ করে নতুন তাৎপর্য। এ প্রসঙ্গে ছয়মাস পূর্বে তারপাশায় কয়েকজন স্টিমার যাত্রীর তর্ক তার স্মরণে আসে –

> একজন বলছিল, 'জিনের কথা কোরান শরিফে লেখা আছে'। আর একজন বলছিল হ্যাঁ লেখা আছে ঠিকই। কিন্তু জিন কী, কেমন, কোথায় থাকে তার কোন স্পষ্ট বর্ণনা নেই। কোরান শরিফের একজন অনুবাদক তাঁর টীকায় লিখেছেন – 'কোরান শরিফের কোনো কোনো আয়াতে জিনের উল্লেখে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয়' 'সুচতুর বিদেশী' বোঝাবার জন্য জিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।'
>
> ফজল মনে মনে বলে, 'ঠিকই বউটারে জিনেই ধইর‍্যা লইয়া গেছিল'।[৯৫]

বস্তুত ধর্মের এরূপ স্পষ্ট ব্যাখ্যায় ঔপন্যাসিকের মানস-চেতনাই স্ফূরিত হয়েছে ফজলের ভাবনায়। অত্যন্ত বিজ্ঞান-মনস্ক এবং উদার মনোভাবের অধিকারী আবু ইসহাক পীর-ভক্তির অন্তরালেও ধর্ম নয়, ধর্মীয়-ব্যবসার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। পীরবাবাকে চর-পাঙাশিয়ার কবর দেয়া হলে তার কবর তথা মাজারে আগমন ঘটবে লাখো দর্শনার্থীর এবং তাদের প্রদত্ত টাকা ও উপঢৌকনে সমৃদ্ধ হবে মাজার সংশ্লিষ্ট সকলে – এ প্রলোভনের ছবি সুযোগসন্ধানী জঙ্গুরুল্লা আরশেদ মোল্লার অন্তরে জাগিয়ে দেয়। ফলে সে নিজ কন্যা রূপজানকে বৃদ্ধ পীরের হাতে সোপর্দ করতে মনস্থির করে।

Dhaka University Institutional Repository

আবু ইসহাক তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসেই ধর্মীয় ভণ্ডামি এবং ধর্মের অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধাচারণ করে উদার ও পরিচ্ছন্ন মানসিকতার জাগরণ কামনা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় সমালোচকের নিম্নোক্ত অভিমত –

> Hence every work of literature has both a fictional and a thematic aspect, and the question is which is more important is often simply a matter of opinion on emphasis in interpretation.[৯৬]

এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের 'theme'থাকলেও 'fiction'ই প্রধান হয়েছে। পূর্ববর্তী উপন্যাস 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'-তে ঔপন্যাসিক ঘটনার আড়ালের সত্যকে উদঘাটন করার যে প্রবণতা গ্রহণ করেছিলেন এ উপন্যাসে সেই প্রচেষ্টা থাকলেও ঘটনার আড়ম্বর ছাপিয়ে তা জোরালো হয়ে ওঠেনি কখনোই।

উপন্যাসের কাহিনী গ্রন্থন এবং ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের অবভাসে পূর্ণতা পায়। 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাসে বহু চরিত্রের ভিড়ে পূর্ণাঙ্গ বা বিশ্লেষণযোগ্য চরিত্র পাওয়া যায় গুটিকয়েক মাত্র। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ফজল। একদিকে চর-দখলের নেতৃত্বদান করে সে উপন্যাসে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, রাজনৈতিক ও সময়-সংক্রান্ত সকল ভাবনা ঔপন্যাসিক তার মাধ্যমেই প্রকাশ করেছেন,এমনকি ধর্ম ও মানবিকতার মৌল প্রবণতাও ফজল চরিত্র-সূত্রে গ্রথিত; অন্যদিকে জরিনা ও রূপজানকে কেন্দ্র করে ফজলের মনোগত ভাবনা প্রকাশে চরাঞ্চলীয় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নসাধ ভাষারূপ পেয়েছে। এই দ্বিবিধ তাৎপর্যে ফজল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি আদর্শের প্রতিফলনে সামগ্রিক ভাবে অনেকটাই নিস্প্রভ এবং কৃত্রিম হয়ে উঠেছে। চর-দখল কর্মকাণ্ডে তার মেধা ও সাহসিকতা, হা-ডু-ডু খেলায় কৌশলী ও শক্তিশালী ভূমিকা, মাছ ধরার বৃত্তি গ্রহণের মাধ্যমে সংস্কার মুক্ত এবং দায়িত্বপরায়ণ মনোবৃত্তি, জেলজীবনে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক চেতনার জাগরণ প্রভৃতি এ চরিত্রের সক্রিয়তার প্রমাণ। ঔপন্যাসিক সব সদগুণের আধার করে এ চরিত্রকে প্রকৃত অর্থে নায়ক করার বাসনায় রক্ত-মাংসের জীবন্ত সত্তায় রূপায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কোনো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য কিংবা অসফলতা এ চরিত্রে অনুপস্থিত। জরিনা ও রূপজান উভয়ের প্রতি আকর্ষণ সামান্য সময়ের জন্য দ্বন্দ্বের দোলাচলে ফজলের

Dhaka University Institutional Repository

মনকে আন্দোলিত করলেও সম্পর্কের কোন দায় সে বহন করেনি জরিনার প্রতি, গতানুগতিকভাবে ফিরে গেছে রূপজানের কাছে।

জেল থেকে পালিয়ে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থে আরশেদ মোল্লা ও জঙ্গুরুল্লার বাড়িতে আগুন লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে ফজল নিতান্ত মানবিকতার দায়ে। কুচক্রীদের সঙ্গে নিরীহ নারী-শিশুকে পুড়িয়ে মারতে তার হৃদয় কেঁপে উঠেছে। এ তার উদার মানবিকতার পরিচয় বহন করে। ঔপন্যাসিকের মানস ধারণ করে ফজল মাতব্বর হলেও নিম্নবর্গের সকলের সঙ্গে সমভাবে অবস্থান করেছে – তাদের মাছ ধরা বা সকল কাজে নিজেও হাত লাগিয়েছে; ক্ষমতার দর্পে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে জন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি। সংবাদ পত্রের মাধ্যমে সে নতুন করে নিজেকে সংযুক্ত করেছে সমগ্র দেশ ও বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহে। এভাবে জনতা ও সময়ের সাহচর্যে চরাঞ্চলীয় মানুষের চিরায়ত জীবনে আধুনিক কৌশল ও পদ্ধতি আনয়ন করে ফজল দিন বদলেরই ইঙ্গিত বহন করেছে।

নায়কের প্রতিপক্ষ খল-নায়ক জঙ্গুরুল্লার চরিত্র নির্মাণেও ঔপন্যাসিক গতানুগতিকতার পরিচয় দিয়েছেন। যেহেতু খল সেহেতু এ চরিত্রের কোথাও ইতিবাচকতার সামান্য স্পর্শও পাওয়া যায় না – কাজ-কর্মে, চিন্তা-চেতনায় কোথাও না। এ চরিত্রের উত্থান নাটকীয়ভাবে খুবই অল্প সময়ে নায়েব-জমিদারদের আশ্রয়ে। ঘোপচরের সামান্য চাষী গরিবুল্লার মাতৃহীন সন্তান জঙ্গুরুল্লা দশবছর বয়স থেকেই অন্যের বাড়িতে জীবিকার সন্ধানে ব্যস্ত। পূর্ণ বয়সে সংসার গড়ে কামলা খেটে খাওয়া জঙ্গুরুল্লার আকস্মিক ভাগ্যোদয় ঘটে পাগলা শেয়ালের কামড় থেকে ঘড়িশার নায়েবকে রক্ষা করায়। পরবর্তীতে নায়েবের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে প্রথমে জমিদারের পেয়াদা-পদ এবং পরে নতুনচর বালিগাঁয়ে জমি লাভ করে সে। ততদিনে ক্ষমতার জোরে চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছে তার। প্রজাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে চাকরি হারালেও আহত বাঘের মতো শোষণের স্বাদ এবং কর্তৃত্ব স্থাপনের বাসনা উভয়ই লাভ করেছে –

> আগের মতো হাবা-গোবা সে নয় আর। একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে ফিরে এসেছে সে। আগে ধমক খেলে যার মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হতো, সে এখন পানির ছিটা খেলে লগির গুঁতো দিতে পারে।জমিদারের কাছারিতে কাজ করে নানা দিক দিয়ে তার পরিবর্তন ঘটেছে। সে দশজনের সাথে চলতে ফিরতে কথাবার্তা বলতে শিখেছে। জমা-জমি সংক্রান্ত ফন্দি-ফিকির, প্যাঁচগোছও শিখেছে অনেক। তাছাড়া বেড়েছে তার কূটবুদ্ধি ও মনের জোর। যদিও প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

> দিকে গাঁয়ের বিচার-আচারে তাকে কেউ পুছতো না, তবুও সে যেত এবং সুবিধে মতো দু-চার কথা বলতো। এভাবে গাঁয়ের সাদাসিধে লোকদের ভেতর সে তার প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই সে গাঁয়ের অন্যতম মাতব্বর বলে গণ্য হয়।[৯৭]

অবস্থা ও চরিত্রগত পরিবর্তনের পর জঙ্গুরুল্লা পদ্মার বুকে জেগে ওঠা চর একের পর এক দখল করে 'টাকার জোর, মাটির জোর আর লাঠির জোর – এ তিনটার জোরে জোরোয়ার' হয়ে; নিজেকে স্থাপন করে চর-জীবনে প্রকৃতির বৈরী রূপের অনুঘটক প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিভূ হিসেবে। স্থানীয় জমিদার ও নায়েবের আনুকূল্যপ্রাপ্ত জঙ্গুরুল্লা অর্থের প্রতিপত্তি ছাড়াও গ্রাম্য সমাজপতিদের মতোই ধর্মব্যবসায়ীদের সাহচর্যে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকেও ক্ষমতার উৎসে পরিবর্তিত করতে প্রয়াসমান। ফুলপুরী পীরের তোয়াজ করে তার দ্বারা সে চৌধুরী পদবী প্রাপ্ত হয়েছে। চরে পীরের কবর বা মাজার স্থাপনায় তার আগ্রহের কারণ কেবল চরের স্থিতি বা ধর্মীয় বিশ্বাস নয়; মাজার-কেন্দ্রিক অর্থাগমও তার উদ্দিষ্ট। গ্রাম্য-রাজনীতিতে সিদ্ধ জঙ্গুরুল্লা মিথ্যা মামলা সাজাতে এবং তা প্রতিষ্ঠিত করে প্রতিপক্ষকে কুপোকাৎ করতেও পারঙ্গম। এসব কিছুই শোষক চরিত্র হিসেবে তার চরিত্রকে ফ্ল্যাট বা সরলরৈখিক করে দিতে পারতো যদি না ঔপন্যাসিক সূক্ষ্মভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তার মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতাকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হতেন।

নিরন্ন জীবনে সাধারণ কামলা জঙ্গুরুল্লা এক অপমানজনক ঘটনায় 'পা-না-ধোয়া' বিশেষণে বিশেষায়িত হয়েছিল। দিনের পর দিন সামাজিক অবমাননা ও অবহেলা তার মনে যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে তারই তীক্ষ্ণ আঘাতে নিজেকে ক্রমশ বদলে নেবার আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়েছে তার মনে। জঙ্গুরুল্লার এই মানসিকতাকে ধারণ করেছেন ঔপন্যাসিক এভাবে –

> রাগের চোটে সে দাঁতে দাঁত ঘষে। নিন্দিত পা দুটোকে মেজের ওপর ঠুকতে থাকে বারবার। তার ইচ্ছে হয়, পা দুটো দিয়ে সে লণ্ডভণ্ড করে দেয় সবকিছু, পদানত করে চারদিকের সব মাটি আর মানুষ। এমনি করেই এক রকমের দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয় তার মনে।[৯৮]

এছাড়াও লোকজনের সামনে তার 'কীর্তিধর' পা টেপার জন্য চাকর নিযুক্ত করা, নিজের পা-কে 'সোনা দিয়ে মুড়ে' রাখার ইচছা-পোষণ, প্রবল অত্যাচারী হলেও পা ধরে কেউ দয়া-ভিক্ষা চাইলে মনে ভাবান্তর সৃষ্টি প্রভৃতি ঘটনায় তার মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা প্রকাশিত – যা তার চরিত্রকে আরও বাস্তবানুগ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

এরফান মাতব্বর ও আরশেদ মোল্লা উভয়ই চরাঞ্চলীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ। এরফান মাতব্বর চরের মালিক হলেও যথেষ্ট অবস্থাপন্ন নয় – শ্রেণী-শোষকের ভূমিকায় তাই সে অবতীর্ণ হয়নি। কোল-শরিক ও অন্যান্য পুলকি মাতব্বর – সকলের প্রতি সে যত্নবান। যদিও চরের ভূমি-বণ্টন করার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে সে এবং অর্থ ব্যতীত কাউকে মানবিকতার খাতিরেও ভূমি প্রদানে সে অসম্মত – তবুও তা কার্যকারণ সূত্রেই গ্রাহ্য। কেননা এই টাকার সিংহভাগ তাকে ব্যয় করতে হয় জমিদার নায়েবদের খাজনা প্রদান ও চরের দখল-স্বত্ব বজায় রাখতে। জরিনার জীবনের বিপর্যয়ের জন্যও তার হঠকারী সিদ্ধান্তই দায়ী। ফজলকে সেই বাধ্য করে জরিনাকে তালাক দিতে এবং তারই ইচ্ছায় জরিনার বিয়ে হয় হেকমত নামের এক পেশাদার চোরের সঙ্গে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনাংশে তার চরিত্রের সক্রিয়তা লক্ষণীয়। আবার অন্যদিকে কোরান তেলাওয়াতের সময় গানের প্রতি আগ্রহ সামান্য সময়ের জন্য হলেও তার অন্তর্জগৎকে উন্মোচিত করে –

> মাতব্বরের মন গানের পাখায় ভর দিয়ে আবার উড়ে চলে। তাকেও টানে গানের আসরের দিকে। সে ঝুপড়ি থেকে বেরোয়। একপা দুপা করে এগিয়ে যায় ধীরে ধীরে। তাকে দেখে সচকিত হয়ে ওঠে সবাই। বন্ধ হয়ে যায় গান। মাতব্বরের ইচ্ছে হয় চেঁচিয়ে বলে, 'ওরে গানে ক্ষ্যান্ত দিলি ক্যান" চলুক, চলতে দে।
>
> মাতব্বর নিজেকে সামলে নেয়। সে সকলের মুরব্বি – মাতব্বর। তার উচিত নয় এদের সাথে হৈ-হুল্লোড় করা।[৯৯]

আরশেদ মোল্লা সার্থক সুযোগ-সন্ধানী চরিত্র। নিজ কন্যাকে সে সম্পত্তিরূপে গণ্য করে নিজ বাড়িতে আটকে রাখে, জঙ্গুরুল্লার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে জামাইকে পুলিশে সোপর্দ করতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না এবং জোর-পূর্বক তালাক নিয়ে জমির লোভে বৃদ্ধ পীরের সঙ্গে মেয়ের পুনর্বিবাহের চেষ্টায় নানা কৌশল ও জাদু-টোনার প্রয়োগে সচেষ্ট হয়। ভীষণ ধূর্ত ও কৌশলী সে। এরফান মাতব্বরকে দেখে নিজ বাড়ি থেকে তার পলায়ন, রূপজানের গয়না লুকিয়ে রাখা প্রতিটি কাজের পেছনে তার সূক্ষ্ম কূট-বুদ্ধির পরিচয় মেলে। দয়া-মায়াহীন লোভী আরশেদ মোল্লার চরিত্রগত রুক্ষতার কারণও অবশ্য ঔপন্যাসিক একস্থানে ব্যাখ্যা করেছেন –

> বেঢকচরে বিঘা সাতেক জমি ছিল তার। গত বর্ষার আগের বর্ষায় বিঘা তিনেক পদ্মার জঠরে বিলীন হয়ে গেছে। বাকি চার বিঘা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে গত বর্ষায়। খুনের চরে জঙ্গুরুল্লা তাকে কুড়ি নল – প্রায় এগারো বিঘা জমি দিয়েছিল। অনেক আশা নিয়ে সে রুয়েছিল

Dhaka University Institutional Repository

> কনকতারা ধান। সেই চরও বেদখল হয়ে গেছে। বসতভিটা ছাড়া আর এক কড়া জমিও তার নেই। এদিকে চালের দাম দিন দিন বেড়েই চলেছে। বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে সে যে কোথায় যাবে, কি করবে, কি খাবে তার কূল-কিনারা করতে পারছিল না, বাঁচবার কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছিল না সে।[১০০]

অভাবগ্রস্ত মানুষ বাঁচার প্রবল তাগিদে ক্রমশই যে স্বার্থান্ধ দয়া-মায়া-বিবেকহীন হয়ে ওঠে – আরশেদ মোল্লা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অবশ্য এ অজুহাতে পাঠক মনে কিছুটা করুণা-সৃষ্টির প্রয়াস পেলেও আরশেদ মোল্লা যে পূর্বাপর লোভী – তাও ঔপন্যাসিক ব্যক্ত করেছেন তার স্ত্রী সোনাভানের মনোগত ভাবনায়। রূপজানকে ল্যাম্বার্ট-পত্নী দত্তক নিতে চাইলেও সোনাভান তা জানায় নি স্বামীকে। সে নিশ্চিত জানতো টাকার লোভে নিজ মেয়েকে দিয়ে দেবে তার স্বামী। এমন চরিত্র অবশ্য বাস্তবেও দুর্লভ নয়।

উপন্যাসের দুই প্রধান নারী চরিত্র রূপজান ও জরিনা। এদের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক নারীর সামাজিক অবস্থানকেও চিহ্নিত করেছেন এ উপন্যাসে। বেঁচে থাকার সংগ্রামে রত চরাঞ্চলীয় মানুষের জীবন প্রবাহেও পূর্বাপর নারীর অবস্থান শোচনীয়। নারী এ সমাজে সম্পত্তিরূপে গণ্য। আরশেদ মোল্লা তারই মেয়ের গয়না বন্ধক রাখার প্রতিবাদে মেয়ের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও মেয়েকে শ্বশুর বাড়িতে পাঠায় নি; বরং জোর-পূর্বক ফজলের কাছ থেকে তালাক নিয়ে রূপবতী কন্যাকে আবারও বিয়ের বাজারে নিলামে তুলেছে এবং কুড়ি নল জমির বিনিময়ে জঙ্গুরুল্লার ইচ্ছেয় বৃদ্ধ ফুলপুরী পীরের সঙ্গে রূপজানের পুনর্বিবাহে সম্মত হয়েছে। কন্যাকে ব্যক্তি নয়, সম্পত্তি বলে বিবেচনাতেই আরশেদ মোল্লা এ সমস্ত কাজে সক্রিয় হয়েছে। এক্ষেত্রে এমনকি তার পিতৃ-স্নেহও কাজ করেনি। অর্থ বা ভূমির সঙ্গেই প্রতিতুলনীয় হয়েছে তার রূপবতী কন্যা রূপজান। মেয়ের মনোভাব জেনেও এবং সব বুঝেও রূপজানের মা সোনাভান তার স্বামীর ইচ্ছের বিরুদ্ধাচারণ করতে পারে নি। কেননা এ সমাজে নারীর মনোভাব বা মতের কোনোই মূল্য নেই। রূপজানকে কেন্দ্র করে ঘটনা আবর্তিত হলেও সে নিজে থেকেছে নিষ্ক্রিয় । একমাত্র বাপের মতের বিরুদ্ধে শ্বশুর বাড়িতে তার গয়না ফেরত পাঠাবার একটি ঘটনায় তার সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। নতুবা অন্য কোন ব্যাপারেই সে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে নি। নিজ মনোভাব ও ইচ্ছার বাস্তব রূপায়ণে কোন পরিকল্পনাই সে গ্রহণ করেনি। অসহায় নারীর মতই কেবল বিলাপ ও অনুতাপে জর্জরিত হয়েছে। অন্যদিকে ফজল রূপজানকে চর-দখলের মতো রাতের অন্ধকারে জোর-পূর্বক নিজ-বাড়িতে তুলে আনার যে ঘটনা সাজিয়েছে,সেখানেও

Dhaka University Institutional Repository

রূপজান সম্পত্তি হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। স্বামী ও পিতা উভয়ের নিকটই সে কেবল সম্পদমাত্র – ব্যক্তি নয়।

জরিনার তালাক-প্রাপ্তি এরফান মাতব্বর তথা পুরুষতান্ত্রিক ইচ্ছা-অনিচ্ছার ফল হলেও এ উপন্যাসের সবচেয়ে শক্তিশালী নারী চরিত্র জরিনাই – রূপজান নয়। একমাত্র এ চরিত্রের মনোজগতের টানা-পোড়েনই উপন্যাসে বিস্তৃতি পেয়েছে। পেশাচার চোর স্বামীর ব্যক্তিগত অক্ষমতা তাকে প্রথম স্বামী ফজলের প্রতি নতুন করে আকর্ষিত হতে বাধ্য করেছে, আবার একই সঙ্গে পাপ-পুণ্যের দোলায় দ্বিধা-বিভক্ত করেছে তার মনকে। একটি রাতের ফজল-সান্নিধ্য তার জীবনকে বদলে দিয়েছে। পরের বাড়িতে ধান ভেঙ্গে নিজ ও শাশুড়ীর পেটের খোরাক জোগাতে ব্যস্ত জরিনার জীবনেও আকাঙ্ক্ষা জেগেছে কিছু পাবার। আবার অন্যদিকে ধর্মভীরুতা এবং পাপবোধ তার আকাঙ্ক্ষা-স্রোতকে রুদ্ধ করতে সচেষ্ট – এই দু'য়ের দ্বন্দ্বেও জরিনা হেরে যায়নি বরং নিজ মনোশক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে তীব্র ভাবে –

> জরিনা তিনবার আয়াতুল কুরসি পড়ে আঙুল দিয়ে কুণ্ডলী দেয় তার চারদিকে আর মনে মনে প্রার্থনা করে, এই কুণ্ডলী ডিঙিয়ে দাগাবাজ শয়তান যেন তার কাছে আসতে না পারে। ফজল বিড়ি টানছে বসে বসে। বিড়ির আগুন আলেয়ার মতো জ্বলছে আর নিভছে। জরিনার মনে হয় আলেয়াদানা যেন দাগা দেয়ার চক্রান্ত করছে। আলোয় আকৃষ্ট পোকার মত তাকে টানছে আর টানছে।
>
> সে চোখ বন্ধ করে। দুহাত দিয়ে শক্ত করে ধরে বিছানো মাদুরটা ...
>
> জরিনার মনের কোটরে ঘুমিয়ে থাকা চামচিকেটা জেগে ওঠে। নিশির ডাকে নিশাচরী বেরিয়ে আসতে চায়। তার ডানার ঝাপটায় জরিনার আঁকা আয়াতুল কুরসীর কুণ্ডলী দূরে সরে যাচ্ছে, ফিকে হয়ে যাচ্ছে বুঝি।
>
> জরিনা উঠে দাঁড়ায়। অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ার সাথে ঝুলিয়ে রাখা তসবি ছড়া সে নামিয়ে আনে। মুসল্লি বাপের স্মৃতিচিহ্ন এ হাজার দানার তসবি। লক্ষ লক্ষ বার জপিত আল্লার নাম ওর প্রতিটি গুটিকায়। মাথা ও শরীর গলিয়ে সে তসবীর মালা নামিয়ে দেয় মাদুরের ওপর। তসবির নিরাপদ আবেষ্টনীর মাঝে সে এবার শক্ত হয়ে বসে। [১০২]

জরিনার অন্তর্জগতের এ লড়াইয়ের একমাত্র হাতিয়ার তার মনোবল এবং শেষপর্যন্ত সে জয়ী হয়েছে, অন্তত ঐ রাতে; ফজলের সান্নিধ্যের কামনায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়নি। পরবর্তীতে অবশ্য ফজলের

Dhaka University Institutional Repository

ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে স্বেচ্ছায় সে গিয়েছে এবং তার সন্তান গর্ভে-ধারণ করেছে; তবুও এ নারীকে পাপাচারী বলে মেনে নেয়া যায় না কোনো মতেই। তার সংগ্রামী জীবন, সত্য-ভাষণ এবং পরিণামে আততায়ী কর্তৃক অপহরণ এবং সম্ভাব্য মৃত্যু পাঠকের মনে এ নারীর প্রতি করুণা ও মমত্ব সৃষ্টি করে। জরিনা সম্পর্কে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের উচ্ছ্বসিত অভিমত এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হল –

> এই উপন্যাসের জরিনার মত চরিত্র এক শরৎচন্দ্র আঁকিতে পারিতেন। একাধিক বার পড়ার পরও আমি এই চরিত্রটির রহস্য অনুধাবন করার চেষ্টা করি। বারংবার প্রশ্ন জাগে – যদি হেকমত জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া আসিত তাহা হইলে এই ধীর স্থির অবিচলিত রমণী কি উত্তর দিত?[১০২]

এ প্রশ্ন পাঠকের মনেও নিশ্চয়ই জাগে কিন্তু ঔপন্যাসিকের শিল্প-কুশলতায় এবং ঘটনার অনিবার্যতায় কোন খটকা থাকে না কাহিনীর বিন্যাসে। প্রকৃতি-সংলগ্ন জীবনকে রূপায়িত করা হলেও এ উপন্যাসে প্রকৃতির নিবিড় পরিচর্যা নেই। বিচ্ছিন্নভাবে দু'এক জায়গায় প্রকৃতির মোটিফকে ব্যবহার করা হয়েছে জরিনা ও ফজলের মনোজগতের দ্বন্দ্ব-রূপায়ণে। জরিনার মনোজাগতিক দ্বন্দ্ব প্রকাশে প্রকৃতির ব্যবহার–

> কৃষ্ণা নবমীর চাঁদ পূর্বদিগন্ত ছাড়িয়ে উঠে গেছে অনেকদূর। ক্ষয়িষ্ণু প্রতিবেশীর আগমনে সচকিত হয়ে উঠেছে আকাশের লক্ষ কোটি তারা। হয়তো বা বিদ্রূপের হাসি হাসছে। ঝিরঝিরিয়ে বইছে শরতের স্নিগ্ধ বাতাস। যেন ঘুমন্ত পৃথিবীর নিশ্বাস প্রশ্বাস।
>
> মোহময়ী এ রাত। এমন লজ্জাহারিণী আশ্রয়দায়িনী রাতটা পলে পলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। এমন প্রীতিময়ী রাত তার জীবনে আর আসবে না কোনো দিন। এ রাতের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।[১০৩]

এছাড়া 'প্রজাপতি' ও 'শুয়োপোকা'র রূপকে যথাক্রমে রূপজান ও নিজেকে কল্পনা করার মাধ্যমে জরিনার মানসে প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যের প্রভাব স্পষ্ট। 'কদাকার শুঁয়োপোকা গুটির কবরে গিয়ে সুন্দর প্রজাপতির রূপ লাভ করে।'[১০৪] প্রকৃতিগত এ পরিবর্তনের অনিবার্যতায় এবং নতুনরূপে উদ্ভাসিত হবার আকাঙ্ক্ষাতেই জরিনার মনে ফজল সম্পর্কে দ্বিধামুক্তি ঘটেছে এবং ফজলের সান্নিধ্যে নারীত্বের পরিপূর্ণতা লাভ করে সে মাতৃত্বের মহিমায় ভাস্বর হয়েছে।

আলোচ্য উপন্যাসে কাহিনীংশে যে সৎ পুলিশ অফিসার ও পুলিশ সুপারের চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা অবশ্য লেখকের ব্যক্তিসত্তারই ছায়াপাত। ব্যক্তিগত জীবনে আবু ইসহাক একজন সৎ পুলিশ কর্মকর্তা

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত ছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বিবেচনার সাহায্যে তিনি কর্মজীবনে বহু সাজানো মামলার সুরাহা করেছেন।[১০৫] এ উপন্যাসের দারোগাও জঙ্গুরুল্লার মিথ্যে মামলা ও কারসাজির উদঘাটন করেছে অনায়াস দক্ষতায়। এ চরিত্র দুটি অঙ্কনে লেখকের বাস্তবাভিজ্ঞতা কার্যকর থাকলেও বাস্তব-জীবনে এদের সংখ্যা যথেষ্ট অপ্রতুল এবং উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনাংশের সঙ্গেও সমান্তরাল নয়।

সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে আবু ইসহাক 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাসে চরাঞ্চলীয় মানুষের জীবন-তরঙ্গ নির্মোহভাবে চিত্রিত করেছেন। উপন্যাসের ঘটনার ঐক্যসূত্র নির্মাণে তিনি প্রধানত বর্ণনা প্রধান রীতির অনুসারী। লেখকের পরিশীলিত মার্জিত বর্ণনায় দৃশ্যানুগ বর্ণনারীতি (Scenic treatment) এবং উপন্যাসের চরিত্রের সংলাপে নাট্যানুগ বর্ণনা (Dramatic treatment) রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। চরের মানুষের দৈনন্দিন যাপিত জীবন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ, প্রতিকূল-প্রতিবেশে সংগ্রামী-জীবনধারণ সমস্ত নির্মাণ করেছেন ঔপন্যাসিক অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে। এ অঞ্চলের মানুষের অবিকল জীবনকে তুলতে আনতে প্রবাদ-প্রবচন, রন্ধন-শৈলী এবং জীবন-ধারণ সম্পর্কিত সমস্ত উপকরণ অনুপুঙ্খে বর্ণনা করেছেন লেখক।

এ উপন্যাসের ভাষা-নির্মাণে ঔপন্যাসিক জীবন-বিচ্ছিন্ন নন বরং জীবন সম্পৃক্ত করার প্রয়াসেই আঞ্চলিক ভাষারীতি অনুসারী। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় সমালোকের নিম্নোক্ত মন্তব্য –

> If the literary medium were to become 'new' to the extent that the material a painter works with, or even the instruments for which a composer writes, can be revolutionized for the purposes of his art, then literature would become not merely divorced from 'life', but from language, its own terms, within which writers work.[১০৬]

ঔপন্যাসিকের পরিশীলিত বর্ণনায় চলিত রীতি অনুসরণীয় – যদিও তাতেও বর্ণনার প্রয়োজনে কখনও কখনও আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে নতুন ভাষা-চরিত্র গঠন করেছে। যেমন –

> মতির হাতে বৈঠা দেয়ার আর এক উদ্দেশ্য ছিল ফজলের। সে মাঝির কাঁথার গাঁটরি তন্নতন্ন করে খোঁজে। চোঙাচুঙি উপুর করে ঢেলে দেখে, হাতিয়ে দেখে নৌকার ডাওর।[১০৭]

মার্জিত চলিত রীতিতে গাঁটরি, চোঙা-চুঙি ডাওর প্রভৃতি আঞ্চলিক শব্দের সাহায্যে ঔপন্যাসিক ভাষার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নির্মাণ করেছেন। এ উপন্যাসের ভাষা-নির্মাণে আবু ইসহাক মূলত মুন্সীগঞ্জ ও

Dhaka University Institutional Repository

ফরিদপুর জেলার আঞ্চলিক ভাষাবৈশিষ্ট্যের অনুসারী।[১০৮] নিজ অঞ্চলের ভাষা ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ও সাবলীল। উপন্যাসের সংলাপ নির্মাণে তিনি পুরোপুরি আঞ্চলিক ভাষা-রীতির অনুসারী। যেমন –

–দবির গোরাপি বলে, 'হুজুর কি ছোডকালে ঘুড্ডি উড়াইছেন নি?'

– ' আরে, ছোডকালে ঘুড্ডি আবার কে না উড়ায়! শোন, তোমাগ পরামিশ মতন যদি তখন তখনি চর দখল করতে যইতাম, তয় কি অইত? খুনাখুনি অইত, মামলা-মকদ্দমা অইত। কিন্তুক এমন খেইল দ্যাখাইলাম, আমার আক্কেলের ঠেলায় ওগ আক্কেল গুড়ুম।'[১০৯]

সংলাপ নির্মাণে আরেকটি বৈশিষ্ট্য এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। গ্রামাঞ্চলে স্ত্রী তার স্বামীর নাম উচ্চারণ তো দূরে থাকে সরাসরি সম্বোধনে কোন বাক্যও বিনিময় করে না তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে উদ্দিষ্ট করে বক্তব্য জানায়। এ উপন্যাসে এরফান মাতবরের প্রতি বরুবিবির এবং আরশেদ মোল্লার প্রতি সোনাইবিবির বক্তব্যে এ ধরনের সংলাপ রীতি গ্রহণ করেছেন ঔপন্যাসিক। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত –

–স্ত্রীকে বলে, হোন, মাতবর আমার কথা জিগাইলে কইও, দিঘির পাড় হাটে গেছে।

–ক্যান? কুড়ুমের ডরে উনি পালাইতে আছে নি?' [১১০]

এধরনের সংলাপ রীতি গ্রামীণ-জীবনকে আরও বাস্তবতা দান করেছে। বাস্তবতার রূপ পরিগ্রহে এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে উপমা-উৎপ্রেক্ষা নির্মাণ করেছেন। যেমন –

১. ফজল তার কবজিতে বাঁধা রশি ধরে ওটা আস্তে আস্তে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে টেনে তোলে। যেন কোনো জলরাক্ষসীর উপরে তোলা একমাথা চুল। [১১১]

২. বেলা একপ্রহরের কিছু পরেই সারা আকাশ ছেয়ে যায় কালো মেঘে। যেন্ ছানি পড়েছে পৃথিবীর চোখে। [১১২]

প্রবাদ-প্রবচনের শিল্পসম্মত ব্যবহারও এ উপন্যাসের ভাষা-বৈশিষ্ট্যকে সমৃদ্ধ করেছে। 'পক্ষীর গুড়া আর মাছের বুড়া, খায় রাজা আটকুড়া', 'চরের বাড়ি মাটির হাঁড়ি, আয়ু তার দিন চারি, 'মা মরলে বাপ অয় তালুই', 'লাডি যার মাডি তার', 'যত কাডি সুতা সব নেয় বামুনের পৈতা', 'ধান বোনে হাইল্যা, প্যাট ভরে বাইল্যা', 'সুইয়া রুই, বইস্যা কই, ক্যাদা ঘাইট্যা ভ্যাদা', 'সাচ্চা গুড় আন্ধার রাইতেও মিডা', 'বউ আনো ঘর দেখে, মেয়ে দাও বর দেখে,' মারি অরি পারি যে কৌশলে' প্রভৃতি লোকায়ত মনীষাজাত প্রবাদ-প্রবচন চরাঞ্চলীয় মানুষের জীবন ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে প্রতিভাসিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার অনুপুঙ্খ বিবরণে ঔপন্যাসিক একদিকে তাদের পেশা সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরণ, অন্যদিকে তাদের খ্যাদ্যাভ্যাসেরও উল্লেখ করেছেন। মাছ ধরার নানা সরঞ্জাম – চাই, দোয়াইর খাদইন, পারন, ঝাঁকিজাল, ধর্মজাল, ইলশাজাল, মইজাল, লেদ বড়শি, ঘাইল প্রভৃতি উল্লেখ যেমন এই উপন্যাসে আছে, তেমনি নদীকেন্দ্রিক মানুষের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম নানান ধরনের নৌকা, ঘাসি নৌকা, পানসি, ডিঙি, গস্তি নৌকা, নিকারি-নৌকা প্রভৃতির নাম জনজীবনের বাস্তবতাকে রূপদান করে। আরও আছে নানা পদের পিঠার বিবরণ – পাটিসাপটা, বুলবুলি, ভাপা, ধুপি, চন্দ্রপুলি, ক্ষিরপুলি, চিতই, পাকোয়ান, শিরবিরন, বিবিখানা, আন্তেশা প্রভৃতি – যা কৃষিজীবী দরিদ্র মানুষের রসনা-বিলাসের পরিচয় বহন করে।

'পদ্মার পলিদ্বীপ'-এ ঔপন্যাসিক আধুনিক শিল্প-আঙ্গিক বা প্রকরণ-পরিচর্যা অবলম্বন করেন নি বটে কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে স্বর্ণসম ভূমির প্রেক্ষাপটে চিরায়ত জীবনধারী মানুষের অন্তর্জগতের বাস্তবতাকে শিল্পরূপ এবং তাদের মনস্তত্ত্বের স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন। ভূমি-কেন্দ্রিক এ উপন্যাসটি তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাস 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'-র মতো সাহিত্যে জগতে ব্যাপক আলোড়ন তুলতে পারে নি। এ সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের অভিমত –

> নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী 'সূর্য-দীঘল বাড়ীতে যতটুকু শিল্পের ছোঁয়া দিতে পেরেছি, 'পদ্মার পলিদ্বীপ'-এও ততটুকু দিতে পেরেছি বলে আমার ধারণা। কেউ কেউ একে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র চেয়েও শক্তিশালী উপন্যাস বলে মনে করেন। এমনও হতে পারে যে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র যশ ও খ্যাতির তলায় 'পদ্মার পলিদ্বীপ' চাপা পড়ে গেছে।[১১৩]

'সূর্য-দীঘল বাড়ী'কে শিল্পকুশলতায় ছাড়িয়ে যেতে পারুক আর না-ই পারুক 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাসে বৈরী প্রকৃতির মুখোমুখি সংগ্রামী মানুষের যে জীবন রূপায়ণ করেছেন আবু ইসহাক তা অনন্য। চিরায়ত জীবনের পাশাপাশি জীবনের জঙ্গমীরূপও দৃশ্যমান এ উপন্যাসে। চর-কেন্দ্রিক মানুষের চিরন্তন জীবনধারায় বিশ্বযুদ্ধ, চালের মুল্য-বৃদ্ধি যে উত্তাপ সৃষ্টি করেছে সে-প্রেক্ষিতে ফজলের সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ ঠেকাবার পথ বাতলে দেয়া মানুষের জীবনে ভবিষ্যত-সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে। ইতঃপূর্বে ক্ষণস্থায়ী চরের আবাসে ভবিষ্যতকে মেনে নেয়াই স্বতঃসিদ্ধ বলে গৃহীত হলেও ফজলের নতুন জীবনদৃষ্টি বিবর্তিত জীবন-ব্যবস্থার ইঙ্গিত বহন করে। আরশেদ মোল্লার শহরে অভিপ্রয়াণের ভাবনাও সময়-অনিবার্যতাকে স্বীকার করেই নেয়। কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি এবং সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও 'পদ্মার পলিদ্বীপ'-কে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বলা যায় নির্দ্বিধায়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাল

আবু ইসহাকের তৃতীয় প্রকাশিত উপন্যাস 'জাল'(১৯৮৮)। এটি একটি গোয়েন্দা উপন্যাস (Detective Novel)। ব্যক্তিগত জীবনে লেখক দীর্ঘদিন পুলিশের গোয়েন্দা শাখায় কর্মরত ছিলেন। কাজেই কোনো বিদেশী গোয়েন্দাকাহিনীর ছায়ায় বা গতানুগতিক ধারায় নয়, সম্পূর্ণ পেশাগত পড়াশুনা ও প্রশিক্ষণ এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের এ উপন্যাসটি তিনি রচনা করেছেন। প্রথম উপন্যাস 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' প্রকাশের জন্য লেখক যখন প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন কিন্তু কোনো ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন না, তখনই নিরাশ হৃদয়ে পাঠকের চাহিদানুযায়ী গোয়েন্দা উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা জাগে তাঁর মনে। নিজস্ব অভিজ্ঞতার প্রতিফলনে 'জাল'-এর পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত করেন ১৯৫৪ সালে – তখন হঠাৎ 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র প্রকাশক পাওয়া যায়। প্রথম উপন্যাস প্রকাশের পর পরই আলোচনা-সমালোচনার লেখকের যে ভাবমূর্তি তৈরি হয় সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে, তা ভেঙে নতুন ইমেজ গড়ে তুলতে চাননি তিনি এই গোয়েন্দা কাহিনী প্রকাশ করে। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর বাক্সবন্দী থাকার পর তাঁর দ্বিধা কাটে, অবশেষে আলোর মুখ দেখে উপন্যাসটি; ১৯৮৮ সালে 'আনন্দপত্র' ঈদ সংখ্যায় এবং ১৯৮৯ সালে কিছু পরিবর্তিত, পরিমার্জিত হয়ে গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে। লেখকের পূর্ব প্রকাশিত গল্প-উপন্যাসের তুলনায় বিষয় ও আঙ্গিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও এ উপন্যাসেও লেখকের প্রতিভার ছাপ স্পষ্ট। বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখায় এ উপন্যাসটির অবস্থান উল্লেখযোগ্য।

জীবনের কোনো গভীর তত্ত্ব বা দর্শন না থাকলেও রোমাঞ্চ ও প্রখর বুদ্ধিদীপ্ততায় স্যার আর্থার কোনান ডয়েল যখন তাঁর অমর সৃষ্টি 'শার্লক হোমস'কে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তখন থেকেই সাহিত্যে ডিটেকটিভ উপন্যাস বা গল্পের নতুন ধারা সৃষ্টি হল। পাঠকের মনে ভীতি বা কৌতূহল জাগিয়ে রোমাঞ্চকর নানা ঘটনা এবং প্রখর বুদ্ধির বিশ্লেষণে রহস্যের উদ্‌ঘাটন কিংবা অপরাধীকে ধৃত করাই এ জাতীয় রচনার বৈশিষ্ট্য। বাংলা সাহিত্যে পাঁচকড়ি দে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায় এবং আধুনিক কালে সত্যজিৎ রায় গোয়েন্দা উপন্যাস রচনা করে পাঠকের চিত্ত হরণ করেছেন। বাংলাদেশের সাহিত্যে কিছু রোমাঞ্চকর কাহিনীর ধারাবাহিকতা সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

হলেও প্রকৃতঅর্থে গোয়েন্দা কাহিনী বলতে যা বোঝায় তা নেই অর্থাৎ বাস্তব জীবনের গোয়েন্দাদের কার্যকলাপ-ভিত্তিক কাহিনী তেমন রচিত হয় নি। সে দিক দিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্যে 'জাল' উপন্যাসটির অবস্থান গুরুত্বের দাবীদার।

আবু ইসহাকের জীবন পরিক্রমায় জানা যায়, ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত তিনি পুলিশ ও নিরাপত্তা বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। সে সময় নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তানে জাল নোটের বেশ প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছিল এবং ১৯৫০ সালে জাল নোটের কয়েকটা মামলার তদন্তের ভার লেখকের উপর ন্যস্ত হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা এবং কল্পনার বুননে 'জাল' উপন্যাসটি রচিত। ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ইলিয়াসের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম-পদ্ধতি এবং সাংগঠনিক দক্ষতা বা দলগত তৎপরতার সমন্বয়ে জাল নোট তৈরি ও প্রচলনকারী একটি অত্যন্ত সংগঠিত ও দুর্ধর্ষ চক্রকে গ্রেফতার করার রোমাঞ্চকর কাহিনী উপন্যাসটির মূল কাঠামো তৈরি করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইলিয়াস-রোকসানার প্রণয় এবং তোত্‌লা দরবেশের ভণ্ডামি উন্মোচনের কাহিনী।

মূল কাহিনী গঠনে লেখকের পেশাগত কর্ম-পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে সুচারুভাবে। সারাদেশে ঘটিত জাল টাকার মামলাগুলোকে তারিখ ও স্থানানুযায়ী সাজিয়ে এবং মানচিত্রে চিহ্নিত করে তদন্তকারী কর্মকর্তা একটি প্যাটার্ন বা কর্মপদ্ধতি খুঁজে পান এবং অপরাধযাত্রার ঘটনাস্থলগুলো যোগকরে যে ষড়ভুজ তৈরি হয় তার মধ্যে চালানকারীর আস্তানা চিহ্নিত করেন। পাঠকের সুবিধার্থে বর্ণনার পাশাপাশি ঔপন্যাসিক মানচিত্র এঁকে ষড়ভুজ এবং অন্যান্য অপরাধযাত্রার ঘটনাস্থল চিহ্নিত করেছেন – যা নিঃসন্দেহে অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছে এবং ঘটনার অনুসরণে পাঠকেরও কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটেছে।

পরবর্তীতে ষড়ভুজের কেন্দ্রস্থলে রংপুর শহরের হেডপোস্টাপিসে ইন্টারসেপশান চালিয়ে সকল চিঠি সেনশার করে উদ্ধার করা হয় একটি বিচিত্র চিঠি। ঐ চিঠি লেখা হয়েছিল কোন পরিচিত বর্ণমালা ব্যবহার করে নয়; চিড়িতন, ত্রিভুজ, বক, হাঁস, ঘোড়ার মাথা, বন্দুকধারী প্রভৃতি ছবি ব্যবহার করে। অদ্ভুত এই চিঠিটা সকলের মনে সন্দেহের উদ্রেক করলেও তার পাঠোদ্ধার সহজ ছিল না। ইলিয়াস চিঠিতে আটত্রিশ রকম চিহ্ন পান। ইংরেজিতে ছাব্বিশটি এবং উর্দুতে সাইত্রিশটি বর্ণ রয়েছে – সুতরাং এটি যে ইরেজি বা উর্দু ভাষার গুপ্তসংকেত নয় তা বোঝা যায়। একমাত্র বাংলাভাষায়ই অধিক বর্ণ থাকায় এটি বাংলাভাষার গুপ্তসঙ্কেত বলে অনুমিত হয়। এর পরের কাজ হল কোন সংকেত কোন

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তা বের করা। এর সমাধান করতে গিয়ে বাংলা বর্ণের চিহ্নিত করণের যে তেরোটি সূত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে তা ভাষা সম্পর্কে লেখকের প্রখর জ্ঞানেরই পরিচয় বহন করে। পরবর্তী জীবনে আভিধানিক হিসেবে স্বীকৃত আবু ইসহাক তাঁর জীবনের শুরু থেকেই যে মাতৃভাষা সম্পর্কে কতখানি সচেতন এবং বিজ্ঞানমনস্ক তার পরিচয় পাওয়া যায় এই সূত্রাবলিতে। যেমন –

> ১ম সূত্রঃ যে চিহ্নটা সবচেয়ে বেশি সেটাকে উপরোক্ত বর্ণমালার তালিকা অনুযায়ী (অ-কার) বলে অনুমান করা হয়। া (আ-কার)-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইহা কখনো শব্দের আদিতে বসে না।
>
> ২য় সূত্রঃ দ্বিতীয় সর্বাধিক চিহ্নটি ে (এ-কার) হতে পারে। ইহা শব্দের আদিতে ও মধ্যে বসে। কিন্তু শব্দের শেষে বসতে পারে না।
>
> ৩য় সূত্রঃ তৃতীয় সর্বাধিক চিহ্নটি 'র' হতে পারে। এর বিশেষত্ব হচ্ছে – এটা বেশির ভাগ সময় শব্দের শেষে বসে। সাঙ্কেতিক চিঠির প্রত্যেকটি শব্দের সর্বশেষ চিহ্নগুলোর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্নভাবে নির্ণয় করলে যে চিহ্নটি সর্বাধিক হয় সেটাই র। শব্দের শেষে কিছু সংখ্যক া (আ-কার) যুক্ত র পাওয়া যেতে পারে।[১১৪]

এরকম তেরোটি সূত্র ধরে গুপ্তচিঠির রহস্য ভেদ হয় অবশেষে। মূলত গোয়েন্দা কাহিনী হলেও অসমাধিত রহস্য বলতে এই চিঠিই এসেছে – বাকি সবটাই ঘটনা-দুর্ঘটনা। চিঠির এই রহস্য একদিকে যেমন কাহিনীতে জটিলতার সৃষ্টি করে পাঠককে কৌতূহলী করে তুলেছে, তেমনি লেখকের ভাষা সম্পর্কিত মেধা ও অনুসন্ধিৎসু মনেরও প্রকাশ করেছে। সেই সঙ্গে পাঠকের চেতনাকে উদ্দীপিত করবার জন্য উপন্যাসের শেষে কয়েকটি সাংকেতিক চিঠি তুলে দেয়া হয়েছে যাতে পাঠক নিজেই রহস্য উন্মোচন করে আনন্দ পেতে পারে।

চিঠির রহস্যভেদের পরের কাহিনী কিছুটা গতানুগতিক। চিঠির সূত্র ধরে একজন অপরাধীকে শনাক্ত করা হয় এবং তার পিছু নিয়ে একসময় পুরো দলটাই হাতে-নাতে ধরা হয়। তবে নানারকম ছদ্মবেশ ধারণ, গাড়ির চাকার ছাপ অনুসরণ করে অপরাধকেন্দ্রে পৌছা, ড্রাইভারের ছদ্মবেশে অপরাধীগৃহে গোয়েন্দা সহকারীর চাকুরী গ্রহণ, হোমিওপ্যাথির শিশিতে করে মেসেজ পাঠানো – এসব কিছু নাটকীয়তা সৃষ্টি করে পুরো সময়টাই টান টান উত্তেজনায় সৃষ্টি করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

মূলকাহিনীর সঙ্গে আরও একটি শাখা-অপরাধ কাহিনী এসেছে তোতলা দরবেশকে কেন্দ্র করে। লেখক প্রথমাবধি যেভাবে চরিত্রটি উপস্থাপন করেছেন তাতে একসময় পাঠকের মনে ধারণা জন্মে যে, এই দরবেশই বুঝি টাকা জালের মূল অপরাধী। অবশ্য পরবর্তী ঘটনাংশে তার অভিনব প্রতারণার পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে এ ভুল ধারণা ভাঙে। লেখক ইচ্ছাকৃতভাবেই দরবেশকে প্রথম থেকেই এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, তার ভণ্ডামি সম্পর্কে পাঠকের মনে কোনো সন্দেহ থাকে না। একটি অপরাধের কাহিনীর সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আরেকটি অপরাধ-চিত্র অঙ্কনের খুব বেশি প্রয়োজন হয়ত ছিল না কিন্তু লেখকের যে মৌল প্রবণতা তা সিদ্ধির জন্যই দরবেশের কাহিনীর অবতারণা। লেখক তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসেই ধর্মীয় ভণ্ডামি এবং তথাকথিত ধর্ম-ব্যবসায়ীর মুখোস উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন – এ উপন্যাসেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

দরবেশের কাহিনীর সঙ্গে রোকসানা-ইলিয়াসের যে প্রণয় কাহিনী এসেছে তা মূল কাহিনী সম্পৃক্ত হলেও অনিবার্য নয়, অনেকটাই আরোপিত। ইলিয়াসের রহস্য-উদ্‌ঘাটনে রোকসানার অবদান আছে বটে – সে একজন অপরাধীকে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু রোকসানার চিহ্নিত করার বহু আগে থেকেই ঐ অপরাধীকে চিঠির সূত্রে চিহ্নিত করা হয়েছিল অর্থাৎ রোকসানার সাহায্য ছাড়াও এ মামলার সমাধান সম্ভব ছিল। মূলত এ চরিত্রটি কাহিনীতে বাড়তি রোমান্স সৃষ্টির প্রয়াসেই সৃষ্ট।

ইলিয়াস চরিত্রটি লেখকের মানস-জাত হলেও তাতে লেখকের ব্যক্তিজীবনেরও ছায়া আছে। লেখকের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'স্মৃতি-বিচিত্রা'রও অধিকাংশ কাহিনী 'ইলিয়াস' নামক চরিত্রের কথন। সেখানেও ইলিয়াস চরিত্রের মাধ্যমে লেখক যেমন নিজেকে তুলে ধরেছেন তেমনি এ কাহিনীতেও ইলিয়াস রেখায় রেখায় না হলেও মোটা দাগে লেখককেই চিহ্নিত করে। কাহিনীতে ইলিয়াসের সততা, মানবিকতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ভাষা-সম্পর্কিত জ্ঞান, সর্বোপরি দরবেশ-পীরের ভণ্ডামির প্রতি অনাস্থা – সবকিছু ব্যক্তি লেখককে প্রতীকায়িত করে। তবে ইলিয়াস চরিত্রের একটি বিষয় লেখকের নিজের নয় – ধার করা; যা ডিটেকটিভ গল্পের নিয়মিত পাঠকের মনে কিছুটা কৌতুকের সৃষ্টি করে। আর তা হল ইলিয়াসের বেহালাবাদন। মানসিক অস্থিরতা নিরসনে সে এই বাদ্যযন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে – উপন্যাসের কয়েকস্থানেই তা বর্ণিত হয়েছে। আমরা জানি, গোয়েন্দাকুল শিরোমণি শার্লক হোমসের বেহালা-প্রীতি ছিল – সেও মনের অস্থিরতা বা আবেগ প্রকাশে বেহালা বাজাতো। এখানে বেহালা

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ এসেছে ইলিয়াসকে শার্লক হোমসের সঙ্গে তুলনা করবার জন্য নয়, বরং সর্বকালের এই অমর সৃষ্টিকে স্মরণ করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যেই।

এ উপন্যাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র স্পেশাল অফিসার আলী রেজা। 'এককালের ঝানু গোয়েন্দা'[১১৫]-এ চরিত্রের সাহায্যে মূলত লেখক দরবেশের ভণ্ডামির কাহিনী উন্মোচন করেছেন। আলী রেজা সারাজীবন পীর সাহেব-শাহ সাহেবদের 'সম্মানিত পরভোজী প্রতারক' বলে অভিহিত করেছেন এবং কর্মক্ষেত্রে আশ্চর্য কুশলতার পরিচয় রেখেছেন। কিন্তু 'বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পারলৌকিক চিন্তা তার পার্থিব বুদ্ধি-চাতুর্যকে ভোঁতা করে দিয়েছে যেন।'[১১৬] সুতরাং খুব সহজেই দরবেশের পাতা ফাঁদে পা ফেলেছেন তিনি এবং অন্ধ-ধর্মবিশ্বাসে তার সারাজীবনের সঞ্চয় খোয়াতে বসেছিলেন। বস্তুত এ চরিত্রের মাধ্যমে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, মানুষ কত সহজেই প্রতারিত হতে পারে এবং বয়স বৃদ্ধি বা পারলৌকিক চিন্তা মানুষকে কতটা বুদ্ধি বিবেচনাহীন করে তোলে।

ভাষা-নির্মাণেও ঔপন্যাসিকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। পূর্ববর্তী উপন্যাসদ্বয়ের মতো এ উপন্যাসেও চলিত এবং উপভাষার ব্যবহার দেখা যায়। তবে লক্ষণীয় যে, লেখক কাহিনীকে বাস্তবানুগ করতে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভিন্নতা অবলম্বন করেছেন। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের ঘটনাস্থল অনুযায়ী ঐ উপন্যাসে ঢাকার পার্শ্ববর্তী আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। 'পদ্মার পলিদ্বীপে' ব্যবহৃত হয়েছে ফরিদপুরের আঞ্চলিক ভাষা কেননা এ উপন্যাসের কাহিনী ফরিদপুর অঞ্চল-কেন্দ্রিক। আবার 'জাল' উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে চট্টগ্রামের উপভাষা – যেহেতু অপরাধীদের মূল অপরাধস্থল চট্টগ্রাম। এছাড়াও এ উপন্যাসে সাধুরীতির বাংলা ভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে – তাও কাহিনীর বাস্তবতা রক্ষার্থেই। থানায় দায়েরকৃত একটি মামলার বিবরণ লেখা হয়েছে সাধু-রীতিতে –

> আজ বেলা অনুমান আট ঘটিকার সময় ৪০/৪৫ বৎসর বয়স্ক একটি লোক তারা মিয়ার মুদিদোকানে আসিয়া দুই সের সরিষার তৈল কিনে এবং তৈলের দাম বাবদ একখানা ভাঁজ করা পাঁচটাকার নোট আগাইয়া দেয়।[১১৭]

ডায়েরিটা ইংরেজীতে লিখিত। পাঠকের সুবিধার্থে তা বাংলায় অনুবাদ করে দেয়া হলেও দাপ্তরিক গাম্ভীর্য রক্ষার্থে সাধু-রীতি অবলম্বন করা হয়েছে। বস্তুত, এখনও দাপ্তরিক চিঠি-পত্র বা অন্যান্য দলিলে সাধু-রীতির ব্যবহারই দেখা যায়। লেখকের সচেতন প্রয়াসে, বিভিন্ন ভাষা-রীতির ব্যবহারে কাহিনীর বাস্তব গ্রহণযোগ্য ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কাহিনী অনুযায়ী এ উপন্যাসের ভাষায় কিছু পেশাগত শব্দও আছে – যা কেবল অপরাধী বিজ্ঞানেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন – 'ফটোজিনকোগ্রাফি' বা হাতে খোদাই ব্লক, ইন্ট্যাগলিও প্রসেস, আটারার প্রভৃতি। এ শব্দগুলো জাল টাকা সম্পর্কিত – প্রথম শব্দদুটি জাল টাকা তৈরির দু'টি পদ্ধতি এবং শেষোক্ত শব্দটি জাল নোট প্রচলনকারী অর্থে ব্যবহৃত। এছাড়াও সাংকেতিক লিপি বা ক্রিপটোগ্রামের উল্লেখ আছে। অদৃশ্য চিঠি লেখা এবং তা উদ্ধারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও অনুসরিত হয়েছে।

বরাবরের মতোই এ উপন্যসের ভাষাতেও লেখক যথাসম্ভব অলঙ্কার-বর্জন করেছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন আঞ্চলিক এবং সংস্কৃত প্রবাদ। এ উপন্যাসে ব্যবহৃত কিছু প্রবাদের উদাহরণ দেয়া হল–

ক) না ধরতে মাগুর মাছ, চড়বো খাজুর গাছ[১১৮]

খ) গতস্য শোচনা নাস্তি[১১৯]

গ) সুঁই খুঁজতে পুকুর সেচন[১২০]

ঘ) খুদ খেয়ে পেট নষ্ট[১২১]

ঙ) মারি কাড়ি পারি যথা যে বা কৌশলে[১২২]

এইসব প্রবাদ-প্রবচন এবং উপভাষার ব্যবহারে এ উপন্যাসের ভাষা হয়ে উঠেছে বাস্তবানুগ এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে এ উপন্যাসে কখনও ব্যবহৃত হয়েছে – দৃশ্যানুগ বর্ণনারীতি, আবার কখনও নাট্যানুগ বর্ণনারীতি। কাহিনীর এক পর্যায়ে রোকসানা ও ইলিয়াসের সম্পর্ককে আরও নিবিড় করার লক্ষ্যে রোকসানার স্বপ্নের যে বিবরণ আছে তাতে হ্যালুসিনেশন পরিচর্যা-রীতি প্রয়োগের দুর্বল প্রচেষ্টা আছে।

'জাল' গোয়েন্দা কাহিনী হলেও এ উপন্যাসেও লেখকের শিল্পকুশলতার পরিচয় আছে। লেখকের পূর্বাপর উপন্যাসের চাইতে বিষয়গত দিক থেকে পৃথক হলেও ভাষা-ব্যবহার বা অন্যান্য আঙ্গিকগত দিক থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। মূলধারার না হলেও গোয়েন্দা-কাহিনী ধারায় 'জাল' উপন্যাসের অবস্থান সুদৃঢ়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. দেবেশ রায়, *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে* (কলকাতা: প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯৯৪), পৃ. ১১

২. দুর্ভিক্ষের অব্যবহিত পরে রচিত তুষার কান্তি ঘোষের প্রতিবেদনমুখী বর্ণনা, The Bengal Tragedy, (Lahore: Hero Publication, ১৯৪৪), পৃ. ৩৯

৩. আবু ইসহাক, *সূর্য-দীঘল বাড়ী* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, অষ্টদশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬), পৃ. ৯.এখন থেকে উদ্ধৃতির জন্যের গ্রন্থের উক্ত সংস্করণ দ্রষ্টব্য

৪. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ১৭

৫. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ১০০

৬. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ১০২

৭. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ১০২

৮. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ১০২

৯. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ১০২

১০.আবু ইসহাক, *স্মৃতিবিচিত্রা* (ঢাকা ; সময় প্রকাশন, বইমেলা ২০০১), পৃ. ২৩-২৪

১১.বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃ. ১১

১২.সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গঃ বাংলা কথা সাহিত্য* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, অক্টোবর ১৯৯৭), পৃ. ৬৯

১৩.সৈয়দ আকরম হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯

১৪.D.H. Lawrence, *The one bright book of life; Selected literary Criticism* (London, 1961), P.105

১৫.নাসির আলী মামুনকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী, প্রথম আলো, ১৬ নভেম্বর, ২০০১

১৬. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৯

১৭. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৯

১৮. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ২১

১৯. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৩০-৩১

২০. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৯৬-৯৭

২১. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৬৯-৭০

২২. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৬৭

২৩. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ২৭

২৪. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৮৮

২৫. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৮৮-৮৯

Dhaka University Institutional Repository

২৬. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৩৫

২৭. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৩৫

২৮. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৬৭

২৯. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৯৯

৩০. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ২০

৩১. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৪৩

৩২. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ২৪

৩৩.সিগমুন্ড ফ্রয়েড, *টোটেম এ্যান্ড ট্যাবু*, অনুবাদ: জেম্‌স্ স্ট্যাচি (লন্ডন : রাটলেজ এ্যান্ড কেগান পল, ১৯৫০), পৃ. ২৪

৩৪. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ১০

৩৫. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ১০

৩৬. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ১২

৩৭.সৈয়দ আকরম হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৩

৩৮.সৈয়দ আকরম হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮

৩৯.Bernard Bergonzi, *The Situation of the Novel* (London and Basirstale ,Second Edition, 1979), P-36.

৪০. হাসান আজিজুল হক, *কথাসাহিত্যের কথকতা* (সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৪), পৃ. ১৮

৪১.মহীবুল আজিজ, *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০২), পৃ. ১৫৮

৪২.মহীবুল আজিজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৭

৪৩. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ২০

৪৪. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৪৩

৪৫. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ১৯

৪৬. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ২০

৪৭. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৬৮

৪৮. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৬৮

৪৯. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৬৮

৫০. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৩২

৫১. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ১০০

৫২. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৫৬

৫৩. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৪৪

৫৪. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৯৫

৫৬. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৯২-৯৩

৫৭. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৯৪

৫৮.মহীবুল আজিজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৭

৫৯.সৈয়দ আকরম হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০২

৬০. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৮৯

৬১. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৮৯

৬২.শিরীণ আখতার, *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী,জুন ১৯৯৩), পৃ. ২৮৬

৬৩. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ২৮

৬৪. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ১৯

৬৫. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ১১

৬৬. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৬২

৬৭. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৪৪

৬৮. *সূর্য- দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৬৫

৬৯. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৯০

৭০. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৩৪-৩৫

৭১. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৩৪

৭২. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৫৪

৭৩. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৬৮

৭৪. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৯৯

৭৫. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৯১

৭৬. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ৯৫

৭৭. *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, পৃ. ১০০

৭৮.দেবেশ রায়, *উপন্যাস নিয়ে* (কলকাতা : দে,জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯১), পৃ. ৪২

৭৯.আবদুল হক, পদ্মার পলিদ্বীপ, গ্রন্থ-সমালোচনা, *উত্তরাধিকার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৪বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা,অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৬),পৃ.১৫৫

৮০.আবু ইসহাক, *পদ্মার পলিদ্বীপ* (ঢাকা : নওরোজ সাহিত্য সম্ভার,তৃতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০০),পৃ.১৬ এখন থেকে উদ্ধৃতির জন্যে গ্রন্থের উক্ত সংস্করণ দ্রষ্টব্য

৮১. *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ.২৩

৮২. *পদ্মার পলিদ্বীপ*,পৃ.২৫-২৬

৮৩. গিয়াস শামীম, *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০২),পৃ.৪

Dhaka University Institutional Repository

৮৪. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬), পৃ.২৮২

৮৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় , *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* (কলকাতা : ১৩৮০) ,পৃ. ৭৬৩-৭৬৪

৮৬. M. H. Abrams, *A Glossary of Literary Terms* (USA: Cornel University 1981) Page 122

৮৭. William Flint Thrall & Addison Hibbard, *A Handbook of Literature* (New York , USA: The Odyssey Press, 1962), Page 406

৮৮.ক.সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গঃ বাংলা কথাসাহিত্য* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, অক্টোবর ১৯৯৭), পৃ. ১১৪

খ.অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, বেতার বাংলা,ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

৮৯. *পদ্মার পলিদ্বীপ*,পৃ. ১৮৪

৯০. *পদ্মার পলিদ্বীপ*,পৃ.১১৬

৯১. *পদ্মার পলিদ্বীপ*,পৃ.৯৪

৯২. *পদ্মার পলিদ্বীপ*,পৃ.৯৫

৯৬. Northrop Frye, *Anatomy of Criticism* (New Jersey: Princeton University Press, 1973), Page. 53

৯৭. *পদ্মার পলিদ্বীপ*,পৃ.৩৭

৯৮. *পদ্মার পলিদ্বীপ*,পৃ.৩৮

৯৯. *পদ্মার পলিদ্বীপ*,পৃ.৮৩

১০০. *পদ্মার পলিদ্বীপ*,পৃ.২৩২

১০১. *পদ্মার পলিদ্বীপ*,পৃ.১৪৩-১৪৪

১০২.আবু ইসহাকের নিকট ২৮ জুলাই ১৯৯১ তারিখে লিখিত ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত-এর পত্র থেকে উদ্ধৃত

১০৩. *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ. ৬৯

১০৪. *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ. ১৫০

১০৫.'প্রতারক' , 'জনসেবক' প্রভৃতি শিরোনামে রচিত আবু ইসহাকের স্মৃতিচারণমূলক গল্প, *স্মৃতিবিচিত্রা* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০১)

১০৬.Stephen Spender, *The Struggle of the Modern*, 1963, Page. 190

১০৭. *পদ্মার পলিদ্বীপ*,পৃ. ১২৬

১০৮.গিয়াস শামীম , *পূর্বোক্ত* ,পৃ. ৩৭

১০৯. *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ. ৯৭

১১০. *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ.৭৫

Dhaka University Institutional Repository

১১১. *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ.১৩

১১২. *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ.১২৬

১১৩.নাসির আলী মামুনকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী, প্রথম আলো, ১৬ নভেম্বর,২০০১

১১৪.আবু ইসহাক ,*জাল* (ঢাকা : নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯),পৃ.৪১ এখন থেকে উদ্ধৃতির জন্যে গ্রন্থের উক্ত সংস্করণ দ্রষ্টব্য

১১৫. *জাল* ,পৃ. ১০

১১৬. *জাল* ,পৃ. ১০

১১৭. *জাল* ,পৃ.৩৫

১১৮. *জাল* ,পৃ.২৭

১১৯. *জাল* ,পৃ.২৯

১২০. *জাল* ,পৃ.২৯

১২১. *জাল* ,পৃ.৪৩

১২২. *জাল* ,পৃ.৫৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আবু ইসহাকের ছোটগল্প: জীবন ও তার শিল্পরূপ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

হারেম

জীবনের খণ্ডাংশকে রস-নিবিড় পরিচর্যায় প্রকাশই ছোটগল্পের অন্বিষ্ট। আধুনিক জীবনে বাস্তব মানুষের সময়ের সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে 'বিন্দুর মাঝে সিন্ধুর অভিব্যক্তি' নিয়ে ছোটগল্পের উদ্ভব। কথাসাহিত্যের এ মাধ্যম জীবনের গভীর রহস্যভেদ নয়, ক্ষণকালের জীবন-তরঙ্গকে ধারণের অভিপ্রায়ে নির্মিত। আকৃতিতে ছোট বলে এই শিল্প-মাধ্যম বর্ণনাধর্মী নয়, ইঙ্গিত-ধর্মী। প্রাচীন আখ্যান, উপাখ্যান, পুরাণ ও রূপকথায় গল্পের আস্বাদ পাওয়া গেলেও ছোটগল্প সর্বতোভাবেই আধুনিক কালের সৃষ্টি। বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার নিবিড় সম্মিলনে সীমিত পরিসরে জীবনের বিভিন্ন ক্ষণ লেখকের জীবনদর্শনে স্নাত হয়ে যে শিল্পরূপ লাভ করে তাই ছোটগল্প। 'A Reader's Guide To Literary Terms' অনুসারে ছোটগল্প বা 'Short Story'–এর সংজ্ঞার্থ ও স্বরূপ –

> A prose narrative briefer than the short novel, more restricted in characters and situations, and usually concerned with a single effect. Unlike longer forms of fiction, the short story does not develop character fully; generally, a single aspect of personality undergoes change or is revealed as the result of conflict, within this restricted form, there is frequently concentration on a single character involved in a single episode. The climax may occur at very end and need not involve a denouement though many other arrangements are possible. Because of limited length, the background against which the characters move is generally sketched lightly. [১]

বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক-স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১)। বিষয়-ভাবনার উৎকর্ষে বাংলা ছোটগল্পকে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। পরবর্তী সময়ে বহু সাহিত্যিকের সযত্ন পরিচর্যায় এ শিল্পমাধ্যমটি বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। সাতচল্লিশোত্তর বাংলাদেশের কথাসাহিত্যেও ছোটগল্প বিশিষ্টতা লাভ করেছে। শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, সরদার জয়েনউদ্দীন, শামসুদ্দীন আবুল কালাম প্রমুখ শক্তিশালী গল্পকার বিষয়ভাবনা, প্রকরণ, শৈলী ও

Dhaka University Institutional Repository

মননের প্রসারে বাংলা ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। এদের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেই বাংলাদেশের ছোটগল্পের জগতে গল্পকার হিসেবে আবু ইসহাকের আবির্ভাব।

কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাকের গল্প-রচনার হাতেখড়ি হয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই। ১৯৪০ সালে 'নবযুগ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প যখন ছাপা তখন তিনি নবম শ্রেণীর ছাত্র। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করলে কথাসাহিত্যিক হিসেবে আবু ইসহাক আলোচিত ও গৃহীত হন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় আবু ইসহাকের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'হারেম'। স্কুলজীবনে তাঁর গল্প রচনার প্রয়াস অধিকতর পরিণত আঙ্গিকে পূর্ণতা পেয়েছে এ গ্রন্থে এসে। 'কানাভুলা', 'ঘুপচি গলির সুখ', 'দাদীর নদীদর্শন', 'পণ্ডশ্রম' , 'পিপাসা', 'প্রতিষেধক', 'বনমানুষ', 'বোম্বাই হাজী', 'শয়তানের ঝাড়ু', 'হারেম'–এই দশটি গল্পের সংকলন আলোচ্য গ্রন্থটি। অধিকাংশ গল্পই একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে রচিত; ধর্মান্ধ মানুষের বিবেককে জাগ্রত করার প্রচেষ্টায় নানা ধর্মীয় বিসঙ্গতিকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ ও উদাহরণের সাহায্যে গল্পকার তাঁর নিজস্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়াস পেয়েছেন গ্রন্থভুক্ত গল্পসমূহে।

404178

ব্যক্তিগত জীবনে আবু ইসহাক ধার্মিক হলেও ধর্মান্ধ যে ছিলেন না তা তাঁর রচনাতেই স্পষ্ট। ধর্ম সম্পর্কিত তাঁর নিজস্ব অভিমত –

> ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত অনুরাগের বিষয়। ধর্মকে পুঁজি করা কোনো মৌলিক লেখকের কাজ নয় । আমার ধর্মবোধ ছিল এমন যে মানুষ মানুষকে ভালবাসবে। মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার ছিল আমার ক্ষোভের বিষয়।[২]

প্রকৃত অর্থেই ধর্মকে পুঁজি করে মানুষের ওপর মানুষের যে অত্যাচার সমকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল তারই শিল্পভাষ্য নির্মাণে প্রয়াসী ছিলেন কথাশিল্পী আবু ইসহাক। তাঁর গল্পে তাই কোথাও সামন্ত সমাজের মহাজন জোতদারের শোষণ, কোথাও ভূমিহীন মজুর শ্রেণীর জীবনসংগ্রাম ও স্বপ্নভঙ্গে মোড়লের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ, কোথাও ধার্মিকের ছদ্মবেশে অধর্মকে লালনের ইতিকথা প্রভৃতি কখনও স্পষ্টভাবে, কখনও রূপকের ব্যঞ্জনায় শিল্পরূপ লাভ করেছে। কাজী ইমদাদুল হক 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম-সমাজের নানা অযৌক্তিক বিশ্বাসের মূলোৎপাটন

Dhaka University Institutional Repository

করার চেষ্টা করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় আবু ইসহাকও আকাঁড়া ধর্ম-অন্ধতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন তাঁর বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে।

'কানাভুলা' (নভেম্বর ১৯৬২) গল্পে জাহিদ তার স্ত্রীর প্রসব-কষ্ট সমাধানে পাইকপাড়ার পীর সাহেবের কাছে পানি পড়া আনতে গেলেও ফিরে আসে লেডি ডাক্তার ও নার্স নিয়ে, কেননা সে আবিষ্কার করে, যে পীর সাহেবের কাছে সে গভীর বিশ্বাসে পানি পড়া আনতে গিয়েছিল সে নিজেই তার মেয়ের সন্তান প্রসবের জন্য বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে আনিয়েছে মহকুমার একমাত্র লেডি ডাক্তার আইরিন গোমেজ ও নার্স সুশীলা বিশ্বাসকে। ডাক্তার ও নার্সের নামকরণও তাৎপর্যপূর্ণ ডাক্তার খ্রিস্টান ও নার্স হিন্দু – এরা দুজনেই বিধর্মী এবং অভিজাত মুসলমানদের কাছে অস্পৃশ্য হিসেবে বিবেচিত; অথচ সেটা যে কেবল বাহ্যিক – জাহিদের বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয় না। তাছাড়া পীরের কাছে বসে থেকে মাইনর স্কুলের শিক্ষা তার অনুসন্ধিৎসু মনকে জাগিয়ে তুলেছিল। একজন যখন পীরকে জানায় যে তার রোগ সারেনি বরং তার বউয়েরও কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ছে, তদুত্তরে পীর সাহেব বলে –

> অ্যাঁ, তাই নাকি! শোক্‌র আল হামদুলিল্লাহ। ব্যারামটা যখন দুই ভাগ হইয়া গেছে, তখন তার জোরও কইম্যা গেছে ইনশাল্লাহ। ব্যারামটা যত বেশি লোকের মধ্যে ভাগ হইব, ততই বেহ্‌তেরীন।[৩]

যেকোন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি – যার স্বাস্থ্য বিষয়ে সামান্য ধারণাও আছে – তার নিকট এসব কথা হাস্যকর মনে হবে, যেমন জাহিদের হয়েছিল। তাই মার আদেশে পানি পড়া সে নিয়েছিল বটে কিন্তু তাতে ভরসা না করে ডাক্তার ও নার্সকে সঙ্গে করে ফিরেছে এবং পীরের পড়া-পানি রাস্তায় পড়ে যাওয়ায় রাস্তার কলের পানি নির্দ্বিধায় তুলে দিয়েছে মার হাতে। জাহিদ যে নিজে কেবল অন্ধকার থেকে আলোয় যাত্রা করেছে তা নয়, মা ও বউকে নিয়ে বছরখানেক পর পীরের বাড়ির বদলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য লেডি ডাক্তারের বাড়ির দিকে যাত্রা করে সত্য উন্মোচিত করেছে তার পরিবারের কাছে। সত্তরের দশকের অনগ্রসর মুসলিম সমাজের একজন প্রান্তিক মানুষের মধ্যে এ জাগরণ কিছুটা বিস্ময়কর হলেও অসাধারণ নয় একেবারে।

'শয়তানের ঝাড়ু' একটি স্যাটায়ারধর্মী রচনা। অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করে এবং সাধারণ মানুষের দুর্বলতাকে অবলম্বন করে কেউ কেউ যে রাতারাতি পীর আউলিয়া বনে যান – তাদের অলৌকিক কর্মকাণ্ডের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন গল্পকার এ গল্পে চমৎকার তীর্যকতায়।

Dhaka University Institutional Repository

গল্পকথক এক প্রখ্যাত যাদুকর বন্ধুর সহকারী। উরস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মোহনপুর মেলায় যাদু দেখাবার উদ্দেশ্যে তারা যাত্রা করে। যাত্রাপথে এক খাদেমের মুখে শ্রবণ করে হাজীবাবার অলৌকিক সব কাজের বিবরণ। মেলার দর্শকদের উদ্দেশ্যে গল্পকথকের যাদুকর বন্ধু সেই যাদুগুলোই প্রদর্শন করেন, যে যাদুগুলোকে জনসাধারণের নিকট হাজীবাবার অলৌকিক কাণ্ড বলে অভিহিত করা হয়েছে দীর্ঘ দিন ধরে। ফলে সাধারণ মানুষের মনে প্রথমে বিভ্রান্তি, পরে সচেতনতার সৃষ্টি হয়। দৃষ্টান্ত –

> মঞ্চে আহুত দর্শকেরা যাদুকরের দু'হাতে হাতকড়া লাগিয়ে তাকে বস্তার ভেতর পুরে, বস্তার মুখ বেঁধে, নিজেদের হাতে গালা দিয়ে সীল করে দেয়। বস্তাবন্দী যাদুকরকে এবার বাক্সে পুরে তালা লাগিয়ে দেয় একজোড়া।[৪]

মিনিট দু'তিন পর যাদুকর যখন দর্শক সারির পেছনে আবির্ভূত হয়ে দাবী করেন যে, তিনি আরব দেশ থেকে এইমাত্র ঘুরে এসেছেন আবার পরক্ষণেই বাক্সের ভেতর সীল গালা করা অবস্থায় তাকে বের করা হয় তখন দর্শকবৃন্দ হতবাক হয়ে যায়। তারা নিশ্চিত জানে যে, এটা যাদু – কোন ধর্মীয় অলৌকিকতা নয়।

গল্পের নামকরণেই গল্পকারের উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত হয় । বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ সকলেই জানে যে, প্রায় আশি বছর পর পর পৃথিবীর আকাশে এক লেজওয়ালা তারা আবির্ভূত হয়। হ্যালির ধূমকেতু নামে পরিচিত এ তারার পুচ্ছটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর এই বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং কমতে থাকে পুচ্ছের দৈর্ঘ্য, এক সময় আকাশেও আর এটি দেখা যায় না – বিজ্ঞানের এই সাধারণ তথ্য প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের একেবারেই অজানা। গ্রামীণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করে হাজীবাবার মতো ধর্মব্যবসায়ীরা। হাজীবাবা এই ধূমকেতুকে শয়তানের ঝাড়ু বলে অভিহিত করেন এবং দাবী করেন যে তারই কেরামতিতে শয়তান তার ঝাঁড়ু নিয়ে অন্তর্হিত হয়েছে। সে রক্ষা না করলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত এই ঝাড়ুর আঘাতে। মাজারের খাদেমের মুখে হাজীবাবার কীর্তি শুনে প্রথম থেকেই পাঠক তার ভণ্ডামি সম্পর্কে জ্ঞাত হয় এবং কৌতূহলে অপেক্ষা করে গল্পের পরবর্তী অংশের প্রতি।

এ গল্পে যে নাটকীয়তা আছে তা অত্যন্ত মনোগ্রাহী। গল্পের শেষাংশে সাধারণের বিশ্বাসভঙ্গের ইঙ্গিত আছে কেবল – কোন সচেতনতার কাহিনী নেই, ছোটগল্পের শিল্পগুণ তাতে রক্ষিত হয়েছে পূর্ণমাত্রায়।

Dhaka University Institutional Repository

আবু ইসহাকের 'হারেম' (১৯৫৬) গল্পটি রূপকধর্মী । মধ্যপ্রাচ্যের খনি-নির্ভর, ধর্মীয় লেবাসে আচ্ছন্ন অথচ ভোগ বিলাসে মত্ত রাষ্ট্রগুলোর আদলে গঠিত সাগরের উপকূলবর্তী ক্ষুদ্র দিস্তান রাজ্য এ গল্পের পটভূমি। ম্যাঙ্গানীজ খনি থেকে প্রাপ্ত অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহারে এ রাজ্যের আমীর মুরাদ বেন-হাম্মাদ আল জুলফিকার পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে গড়ে তুলেছেন বিশাল হারেম। সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় একজন স্বৈরশাসক কতখানি স্বেচ্ছাচারী, একক কর্তৃত্বপরায়ণ, ভণ্ড হতে পারে তারই জলজ্যান্ত প্রমাণ যেন দিস্তানের এই আমীর। মোসায়েব পরিবৃত স্থূলরুচির আমীর মিকায়েলের অমূল্য তৈলচিত্র জুলিয়েত চল্লিশ হাজার পাউন্ডে বিক্রির খবরে বিস্মিত হন। এটা এক ধরনের পারভারশান বা বিকৃতি বলে বোধ হয় তার নিকট, কেননা চল্লিশ হাজারে যেখানে দশ দশটা জীবন্ত মেয়েমানুষ পাওয়া যায় যেখানে সেই টাকায় তৈলচিত্র কেনাটা একটা অদ্ভুত রকমের বিকৃতি-ই বটে। এর কারণ হিসেবে তাঁর যুক্তি – যেহেতু এই ইংরেজরা একটার বেশি সাদী করতে পারে না, সেহেতু তাদের এই ভীমরতি।

স্বকাল ও স্ব-সমাজের সংকট-সম্ভাবনা অনুসন্ধান সনিষ্ঠ সাহিত্যিকের সফলতার অপরিহার্য সূত্র। জীবনবিচ্ছিন্ন লেখক সফলতা লাভ করতে পারেন না কোন অর্থেই। অনাগত কালের অমিত সম্ভাবনার আকাঙ্ক্ষা অথবা অমল ধবল অস্বুদরাশির অন্তরালে নিবিড়-হিংস্র মেঘের সুদূর সম্ভাবনা কেবল একজন লেখকের পক্ষেই দেখা সম্ভব। আর লেখক যদি হন রাষ্ট্রের ভেতর-বাইরের সকল অপতৎপরতার সন্ধানদাতা তবে তার পক্ষে ভবিষ্যৎ সরকার কাঠামো বা অদূর ভবিষ্যতের রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ইঙ্গিত প্রদান বিস্ময়কর নয়। গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তা আবু ইসহাক ১৯৫৬ সালে করাচি অবস্থানকালে 'হারেম' নামের রূপকধর্মী যে গল্পটি লিখেছেন, তাতে মূলত একজন একনায়কের শাসনব্যবস্থার অসারতাকে উপজীব্য করা হয়েছে।

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের পর ১৯৫৪ সালে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দিয়ে যে স্বেচ্ছাচারী শাসক প্রতিষ্ঠিত হয় ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চে, আবার তাকে হটিয়ে ১৯৫৮ সালে যে সামরিক শাসক ক্ষমতা দখল করল – আবু ইসহাক 'হারেম' গল্পে মূলত সেই স্বেচ্ছাচারী শাসককেই রূপায়িত করেছেন। কেননা ১৯৫৬ সালে এ গল্প লেখা হলেও গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তা আবু ইসহাকের পক্ষে ক্ষমতার সম্ভাব্য পট পরিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক নয়।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বোক্ত গল্পগুলোর তুলনায় 'দাদীর নদীদর্শন' অনেকটা ভিন্নধর্মী – এতে কোন রূপক বা ভণ্ডামির উন্মোচন নেই, ধর্মীয় কোন অন্ধসংস্কার ভেদ করে ফুটে ওঠে নি কোন আলোর ইশারা। এ গল্পে একান্তই অন্ধ ধর্মবিশ্বাস তথা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান সমাজের নিগূঢ় বাস্তবচিত্র রয়েছে। নতুন দিনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত আছে অবশ্য তবে তা দীর্ঘদিনের লালিত সংস্কারকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি।

নদীবিধৌত এ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ ও জীবনযাপন করেও , কখনও নদীদর্শন করে নি গল্পের প্রধান চরিত্র রাজাপুরের মীর হাবেলীর ষাটোর্ধ্ব মৌলবী দাদী। তার কঠোর পর্দানিষ্ঠা, পুরোনোকে আঁকড়ে ধরার অদ্ভুত একগুঁয়েমির কাহিনীই এ গল্প। তিনি ওষুধ খাননা – কেননা ওষুধ বিলিতি, অতএব হারাম, চকোলেট কি বিস্কুট – সবই তার নিকট হারাম। নিজ বিশ্বাস রক্ষায় তাকে রীতিমতো জেহাদ পর্যন্ত করতে হয়েছে –

> মীর গৃহে গৃহ-বিবাদ হয়েছে অনেকবার। এই বিবাদকে দাদী বলেন জেহাদ। জেহাদ হয়েছে ছেলেদের ইংরেজী পড়া নিয়ে, গ্রামোফোন-রেডিও বাজানো আর দেয়ালে ছবি টাঙ্গানো নিয়ে।.....দাদী অনেক জেহাদ ফতে করেছেন, মদিনা মনওয়ারা ও কাবাশরীফের তজবীর ছাড়া মীরহাবেলীর কোন দেয়ালে একখানা ছবি খুঁজে পাওয়া যাবে না। ছবির ওপর চোখ পড়লে নাকি ওজু নষ্ট হয়। তাঁর ভয়ে হাবেলীর চৌসীমানার মধ্যে কেউ রেডিও-গ্রামোফোন বাজাতে সাহস করেনি কোনদিন।[৫]

মেয়েমহলের একচ্ছত্র নেত্রী দাদী এ বাড়ির মেয়েদের শিক্ষা থেকে দূরে রাখতে পারলেও ছেলেদের ধরে রাখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার বিধি-নিষেধের জাল ছিড়ে এ বাড়ির ছেলেরা বিলেত পর্যন্ত ঘুরে এসেছে কিন্তু নতুনের এ বিজয়ে প্রভাবিত হন নি দাদী । বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার সম্পর্কে স্বেচ্ছায় অজ্ঞ এ বৃদ্ধা সামান্য এক নদী পাড়ি দিতে গিয়ে সমুদ্র পীড়ার ন্যায় নদী পীড়ায়(?) আক্রান্ত হয়ে মারা যান। কূপমণ্ডুক মুসলমান সমাজ যে কতটা ক্ষীণজীবী, হাস্যকরভাবে কতটা পশ্চাৎপদ – দাদীর বর্ণনায় পরোক্ষে হলেও তার কিছুটা আভাস দেবার চেষ্টা করেছেন গল্পকার আলোচ্য এ গল্পে।

ধর্মীয় কুসংস্কার আর পশ্চাৎপদতা নয় ধর্মীয় বিশ্বাসকে পুঁজি করে একদল কৌশলী ধূর্ত মানুষের ভণ্ডামির অনুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায় 'বোম্বাই হাজী' শীর্ষক গল্পে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু'

Dhaka University Institutional Repository

(১৯৪৮) উপন্যাসে মাজারকেন্দ্রিক যে ধর্মব্যবসায়ীর চালচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে মনোজাগতিক ও আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে; প্রায় একদশক পরে একই ধরনের বিষয়কে ভিন্ন আঙ্গিকে ছোটগল্পের ইঙ্গিতধর্মিতায় এবং চমকপ্রদ নাটকীয়তায় আবু ইসহাক উপস্থাপন করেছেন 'বোম্বাই হাজী' গল্পে।

মাজারকেন্দ্রিক এ গল্পে মাজারের দখলদারিত্ব নিয়ে লড়াই এবং কূটকৌশলের জোরে ধর্মপ্রাণ মানুষকে মোহিত করে মাজারের দখল কায়েমের এক মনোজ্ঞ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পুরুষানুক্রমে এই মাজারের পীর হিসেবে গদিনশীন হয় বাড়ির বড় ছেলে – শর্ত একটাই – তাকে হজ্ব করতে হবে। কালের পরিক্রমায় সাদাসিধা বড় ভাই আলী নেওয়াজকে বঞ্চিত করে পিতার রেখে যাওয়া টাকা আত্মসাৎ করে কনিষ্ঠ গুল নেওয়াজ যখন হজ্ব করে গদিনশীন হয় – বিবাদের সূত্রপাত হয় তখন থেকেই। গুলে নেওয়াজের ছেলে আবিদ আলী হজ্ব করে আসার পর যখন মক্কা আর মদিনার উলট-পালট বিবরণ দেয় তখন থেকে তার নাম দেয়া হয় বোম্বাই হাজী অর্থাৎ মক্কা গিয়ে সে হজ্ব করে নি, বোম্বাই থেকে ফিরে এসে নিজেকে হাজী বলে দাবী করেছে । এই বোম্বাই হাজী যখন এক সুবেহ্ সাদেকের সময় মাথায় তাল পড়ে মারা যায়,তখন তার কবর দেয়া নিয়ে শুরু হয় নতুন হাঙ্গামা। সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষ বিশেষত বিরোধী পক্ষ মাজারের পবিত্র মাটিকে কপট ভণ্ড লোক – হোক সে পীর – সমাহিত করতে বাধা দেয়। তারা সাধারণ মানুষের মনে ধর্মীয় অনুভূতি জাগিয়ে তোলে এভাবে –

> ঐ কলসী পীরের পোলা বোম্বাই হাজীরে এই মাজার শরীফে কবর দিলে মাজারের ফজিলত বরবাদ অইয়া যাইব। এই এখন পর্যন্ত, এই মাজারের মা'ডি তাবিজ কইর‍্যা মাজায় দিলে শান্তিতে গব্ব খালাস অয়। রস, বাত, শূল বেদনা কমে, গলায় দিলে হাঁপি কাশ আরাম অয়। এই রকম আরো কত ব্যারাম-আজারে যে ফল অয় তার শুমার নাই। এমুন পাক মাডি আমাগ চউখের সামনে নাপাক অইব, আর, আমরা ভেড়ী-বকরীর মত হাঁ কইর‍্যা চাইয়া দেখুম, এইডা কি আইতে পারে?[৬]

অবশেষে পার্থিব লাভের কাছে অপার্থিব বিশ্বাসের পরাজয় হয়। উরসের মেলার খাজনার ছয় আনা পাবার প্রতিশ্রুতিতে সাবেদ মোড়ল নামক এক ধূর্ত ব্যক্তি এমন কৌশল করে যে, সকলে নির্দ্বিধায় বোম্বাই হাজীকে প্রকৃত হাজী বলে মেনে নেয়; মাজারে তার দাফনের সুব্যবস্থা করে এবং নিঃশর্ত নির্দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করে বোম্বাই হাজীর পুত্র জাহানজেবের নিকট। এক অপরিচিত লোক এসে

Dhaka University Institutional Repository

যখন জানালো যে আবিদ আলী ও সে এক সঙ্গে হজ্ব করেছে এবং হজ্বের সময় পাঁচশো টাকা ধার নিয়ে ছিল সে আবিদ হাজীর নিকট হতে, আজ এসেছে সে টাকা ফেরত দিতে তখন গ্রামের লোকেরা তার কথা বিশ্বাস করে। একজন অপরিচিত লোক স্বেচ্ছায় যখন এত বড় অঙ্কের অর্থ পরিশোধ করতে এসেছে তখন গ্রাম্য সাধারণ মানুষের অন্তর নিঃসঙ্কোচে মেনে নিয়েছে হাজীর হজ্ব করার প্রমাণ এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে তারা কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়েছে।

বস্তুত নাটকীয় এ ঘটনার মাধ্যমে গল্পকার একদিকে যেমন মাজারকেন্দ্রিক ধর্ম-ব্যবসার প্রতি কটাক্ষ করেছেন, অন্য দিকে এদেশের সাধারণ মানুষ যারা প্রকৃত সরল এবং ধর্মপ্রাণ – তাদের বিশ্বাসকেও ধারণ করেছেন বাস্তবতার নিরিখে –

> হাজী বাবার মাজারে হত্যে দিয়ে লুলা ও কুষ্ঠরোগী ভালো হয়েছে, অন্ধ চক্ষু ফিরে পেয়েছে, এরকমও শোনা যায়।[৭]

সাধারণের এ বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ এ গল্পের উপজীব্য বিষয় নয়, তবে বর্ণনাভঙ্গিই এমন যে, ঘটনার বিবর্তনে প্রকৃত সত্য পাঠকের নিকট উন্মোচিত হয়।

দাম্পত্য জটিলতা এবং পুনর্মিলনের কাহিনী হলেও 'প্রতিষেধক' গল্পে রোমান্টিক আবহ তেমন নেই যতটা আছে জীবন জটিলতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, সর্বোপরি নারীর অধিকার আদায়ের দৃপ্ত উচ্চারণ। পুরুষের বহুবিবাহ আসলেই কতটা অসঙ্গত ও অন্যায় এ গল্পের কাহিনীতে তা সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষিত দম্পতি আফতাব ও আতিয়ার দাম্পত্যে এক সময় ক্লেদ জমতে থাকে। দুই সন্তানের জনক আফতাব প্রভূত অর্থ-বিত্তের অধিকারী হয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ের বাসনা পোষণ করেন। কেবল তাই নয় পাত্রী এবং বিয়ের তারিখও স্থির করেন স্ত্রীর অমতেই। কোনভাবেই তাকে ফেরাতে না পেরে প্রতিষেধক হিসেবে স্ত্রী আতিয়াও দ্বিতীয় বিয়ের ঘোষণা দেন যদিও আফতাবের কাছে তা নিতান্তই হাস্যকর মনে হয়। কেননা ইসলাম ধর্মে পুরুষের একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হলেও নারীর জন্য তা নিষিদ্ধ। কিন্তু স্ত্রী আতিয়ার যুক্তি –

> শোনো, একজন স্ত্রীলোকের চারজন স্বামী হলে সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে গোলমাল বাঁধবে, কার সন্তান কোনটি চেনা যাবে না – এই যুক্তিতে চৌদ্দ শ বছর আগে পুরুষদেরই শুধু চারটে বিয়ের অধিকার দেয়া হয়েছে মেয়েদের দেয়া হয়নি।এটা বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগে একাধিক

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীর সন্তানদের চিনে বের করা মোটেও কষ্টকর নয়। সন্তানের রক্ত পরীক্ষা করলেই জানা যাবে, কে কার সন্তান।[৮]

শধু তাই নয়, রক্তের শ্রেণীবিভাগ থেকে কিভাবে জনককে চেনা যাবে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দেয় আছে এ গল্পে। একবিংশ শতাব্দীতে জিনেটিক ইন্‌জিনিয়ারিং-এর চরম উৎকর্ষের যুগে জিন পরীক্ষা করে নির্ভুলভাবে জনকের পরিচয় নির্ণয় সম্ভব কিন্তু ১৯৬২ সালে (গল্পের ঘটনাকাল ১৯৬১, প্রকাশকাল ১৯৬২) যখন ফ্যামিলি ল' অর্ডিন্যান্স পর্যন্ত পাশ হয়নি, এবং মুসলমান সমাজ চরম অশিক্ষা, কুশিক্ষায় দিন যাপন করছে তখন একজন মুসলিম মহিলার মুখে (হোক সে উচ্চশিক্ষিত, বিলেতে ডিগ্রি প্রাপ্ত চাকুরিজীবী) এ ধরনের যৌক্তিক উচ্চারণ অভাবনীয় না হলেও অসাধারণ তো বটেই।

ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করে নয় বরং আধুনিক মানসিকতার বা বলা যায় মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পকার তার সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধানের যথার্থ ব্যাখ্যা দেবার প্রয়াসী হয়েছেন এভাবে –

> সাধারণ মানুষের পক্ষে সব স্ত্রীকে সমান চোখে দেখা কখনও সম্ভব নয়। কোরান শরীফে অসম্ভব শর্ত জুড়ে দিয়ে পরোক্ষভাবে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
>
> শোন, ওহোদের যুদ্ধে অনেক মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। যাঁরা বেঁচে ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল মুসলমান মেয়েদের তুলনায় কম। ঐ সময়ে সুরা নিসা নাজেল হয়। মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আর ঐ বাড়তি মেয়েলোকদের গতি করবার জন্যেই আল্লাহ্‌তায়ালা একজন পুরুষকে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের অধিকার দেন। তাও আবার শর্তসাপেক্ষে।[৯]

আবু ইসহাকের ধর্মানুভূতির পরিচয় পূর্বে দেয়া হয়েছে, বিভিন্ন রচনায় তাঁর উদার ধর্মীয় মানসিকতার পরিচয়ও বিধৃত হয়েছে কিন্তু এ গল্পে বহুবিবাহের বিপক্ষে ধর্মকে অস্বীকার না করে ধর্মীয় বিধানের যে অপূর্ব ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা তাঁর উদার, যুগোপযোগী এবং আধুনিক মানসিকতার পরিচয় বহন করে। গল্পের মধুরেণ সমাপ্তি অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঘটেছে – স্ত্রী সত্যি সত্যি অন্য একজনকে বিয়ে করতে যাচ্ছে তা সইতে না পেরে আফতাব নিজের সম্মান বজায় রাখতে বিয়ের পথ থেকে ফিরে আসে এবং স্ত্রীর আনুগত্য স্বীকার করে নেয়।

আবু ইসহাক কালিক বিবেচনায় পঞ্চাশের দশকের সাহিত্যিক। উপমহাদেশের সমকালীন ঘটনাবহুল রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক সংকট তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। চাকুরি সূত্রে তাঁকে হতে হয়েছে আরও

Dhaka University Institutional Repository

বেশি সমকালীন রাজনীতি সচেতন। এই সচেতনতা তাঁর কথাসাহিত্যকে করেছে সমকাল-লগ্ন। তাঁর উপন্যাসে যেমন প্রতিবিম্বিত হয়েছে তেতাল্লিশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাজন, দেশত্যাগী মানুষের সমস্যা এবং সাতচল্লিশ-উত্তর দুর্ভিক্ষ, তেমনি বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাঙালির মাতৃভাষার অস্তিত্ব তথা আত্মপরিচয়ের সঙ্কট প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর 'পিপাসা' ও 'পণ্ডশ্রম' গল্পদুটিতে। সরকারী চাকুরে হবার সুবাদে স্পষ্ট করে নয় কিছুটা ব্যঙ্গের আড়ালে মাতৃভাষা প্রীতির পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন – সচেতন পাঠক মাত্রই তা অনুধাবনে সক্ষম। সমালোচকেরাও এ বিষয়ে স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন –

> মূলত তিনি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া থেকেই গল্প দুটি রচনা করেন। এ অনুমানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ 'পণ্ডশ্রম' গল্পটির রচনাকাল জুন ১৯৫৩ এবং 'পিপাসা' গল্পটির রচনাকাল মার্চ ১৯৫৭। প্রথোমক্ত গল্পটি আবু ইসহাক লিখেছিলেন ঢাকা অবস্থানকালে এবং দ্বিতীয় গল্পটি রচনা করেন করাচিতে চাকরিকালীন বসবাস সূত্রে । লেখক গল্প দু'টি রচনার প্রেরণা বোধ করেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। এমন প্রতীতির পরিচয় বহন করে গল্প দু'টির অন্তর্গত স্থানিক-কালিক পটভূমি এবং উপজীব্য বিষয়।[১০]

ভাষা-আন্দোলনের অব্যবহিত পরে রচিত 'পণ্ডশ্রম' গল্পটি মূলত ব্যঙ্গাত্মক। ব্যঙ্গের আড়ালে লেখক মাতৃভাষার অবমাননাকারীদের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। উত্তম পুরুষে বিবৃত এ গল্পের কথক একজন লাইব্রেরিয়ান। অত্যুৎসাহে দায়িত্ব পালনের শুরুতেই গল্পকথক বহুদিন অব্যবহৃত একটি আলমারির নাভিতালায় চাবি ঢুকিয়ে তা খোলার চেষ্টা করে প্রথমত ব্যর্থ হয়। এরপর গল্পের বিবরণ –

> জং ধরে গেছে বোধহয় তালায়। দারোয়ান কেরোসিন তেল নিয়ে আসে। তেল দিয়ে কিছুক্ষণ রাখার পর চাবি ঘোরে । আলমারির কবাট খুলে দেখি, ভেতরে নাভিতালাজুড়ে এক কুমোর পোকার বাসা।[১১]

এভাবে গল্পে সূচনাস্তবকটি প্রতীয়াকিত করেছেন গল্পকার। কেননা পাঠক গল্পের ভেতরে আরও একটু প্রবেশ করা মাত্রই বুঝতে পারে গল্পের কয়েকটি চরিত্রের অন্তর্লোকে 'জং' ধরেছে। এ 'জং' অচেতনার। কথক চরিত্রটি লক্ষ করে – সদ্য খোলা আলমারি ভর্তি কেবল ইংরেজি গল্প-উপন্যাস। বইগুলো দীর্ঘদিন অপঠিত। এবার 'জং ধরা' তালার ভেতর 'কুমোর পোকার বাসা' তৈরির কারণটি বোধগম্য হয়। কিন্তু ইংরেজি গল্প-উপন্যাস না পড়ার কারণ? এর উত্তরও কথক পেয়ে যায় কবির উক্তি থেকে:

Dhaka University Institutional Repository

নানান দেশের নানান ভাষা

বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?

কথকের ব্যক্তিগত উপলব্ধি:

একমাত্র স্বদেশী ভাষায়ই মানুষের আশা পূর্ণ হয় – এ আমি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি। কারণ বিদেশী ভাষা অনেকবার আমার আশা ভঙ্গ করেছে।

গ্রাজুয়েট কথক 'তিনজন খাস বিলেতি সাহেব' এর সামনে বিশ টাকা বেতনের একটি চাকরির 'ইন্টারভিউ'-এর হাস্যাস্পদ ও তিক্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয়। অথচ চৌদ্দ বছর ধরে কথক মাতৃভাষার চেয়ে 'অন্তত চারগুণ সময় আর শ্রম' ব্যয় করেছে ইংরেজি শিখতে। তার উপলব্ধি যে, বিদেশী ভাষা মাতৃভাষার মতো প্রত্যক্ষভাবে বোধগম্য হয় না, বরং তা 'মাতৃভাষায় তর্জমা হয়ে' তারপর উপলব্ধ হয়।

'পণ্ডশ্রম' গল্পে আনসার আলী বি এ (গ্রাজুয়েট) ইংরেজি ভক্ত। অবশ্য " নামের পাশের ডিগ্রিটা তাঁর এতই প্রিয় যে, এ ডিগ্রি প্রেমের নমুনা তাঁর বাসার নাম ফলক, চেয়ার-টেবিল, তাক, দোয়াতদানি, মায় বদনাটিতে পর্যন্ত জাজ্বল্যমান"[১৩] দেখা যায়। ক্লাব-লাইব্রেরিতে তিনি নিয়মিত আসেন। বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে – ক্লাবের রেডিওতে এ খবর শুনে জাহিদ খুশি হলেও আনসার আলী বি এ বিরূপ মন্তব্য করেন। তিনি 'ভ্রূ কুঁচকান' এবং 'নাক সিটকে' মন্তব্য করেন –

হুঁহ, বাংলা একটা ভাষা, সেটা হবে রাষ্ট্রভাষা[১৪]

আনসার আলী রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সরাসরি ইংরেজি ভাষার পক্ষ নিয়ে বলেন :"আমি ইংরেজির ভক্ত।"[১৫] অথচ তিনি ক্লাব-লাইব্রেরির কোন ইংরেজি গ্রন্থ পাঠ করেন না।

ভুল ইংরেজিতে হাস্যরসাত্মক ঘটনা বলে ক্লাবের আড্ডা জমিয়ে তোলে মোবারক ও আহমদ। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের ঢাকাতে এসে কোট কিনতে গিয়ে ওভারকোট পছন্দ হলে পেটিকোট কিনতে চাওয়ার হাস্যকর গল্পে সবাই হেসে ওঠে। আড্ডায় আনসার আলীর ভুল ইংরেজি বলার ঘটনাও উল্লেখ করে কথক। কথকের অতিথি মামাও ক্লাবের আড্ডায় অংশ নেয়। পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র বলে মামা আরবিকে রাষ্ট্র ভাষা করার পক্ষে মত দেয়। অথচ ক্লাবের আলমারিতে কয়েকখানি আরবি হাদিস গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও কেন যে মামা বাংলায় অনূদিত মেশকাত শরীফ এবং নবী সম্পর্কিত বাংলা বই পাঠ করে তার রহস্য অপ্রকাশিত থাকে না। ভাগ্নে মতিনকে পরীক্ষা পাসের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

আরবি ভাষা পাঠদান দিতে গেলে মামার আরবি বিদ্যাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। আবু ইসহাক 'পণ্ডশ্রম' গল্পে আনসার আলী বি এ এবং কথকের মামা চরিত্রের মাধ্যমে মাতৃভাষা বাংলার বিরোধীদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন।

'পিপাসা' গল্পে প্রবাসী নারীর মাতৃভাষার প্রতি তীব্র আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। জোহরা বেগম উচ্চপদস্থ স্বামীর চাকুরিসূত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের হায়দারাবাদ শহরে তিনবছর ধরে বসবাসরত। ব্যস্ত স্বামী মেহবুব সব সময় ইংরেজিতে কথা বলতে পছন্দ করে, তাই জোহরা বেগম মাতৃভাষায় কথা বলার সঙ্গী খুঁজে পায় না। এজন্য রেডিওর বাংলা অনুষ্ঠান তার খুব প্রিয়। রেডিওর বাংলা অনুষ্ঠান শোনার সূত্রে ছেলের বয়েসি প্রবাসী বাঙালি যুবক হাসানের সঙ্গে জোহরা বেগমের পরিচয় হয়। রেডিওতে সব সময় বাংলা অনুষ্ঠান হয় না। তাই হাসান মাঝে মাঝে বাসায় বেড়াতে এলে জোহরা বেগম তার সঙ্গে বাংলায় কথা বলে আনন্দ পান।

সারাদিনের মধ্যে সাড়ে ছটায় ঢাকা রেডিওতে বাংলা গান হয় আর পৌনে সাতটায় বাংলা খবর। বাংলা সঙ্গীতের সুরে জোহরা বেগমের হৃদয়ের তন্ত্রিগুলো জেগে ওঠে। কিন্তু সব সময় রেডিওর মিটারের কাঁটা ঘুরিয়ে সঠিক স্থানে বসানো যায় না। কারণ এর দু' দিকে দুটি শক্তিশালী বেতার কেন্দ্র – একটি ইংরেজি অন্যটি আরবি। লেখকের অভিব্যক্তি –

> বাঁ দিকে ইংরেজী। ডান দিকে আরবি। দু' দিকের দুটি শক্তিশালী বেতার কেন্দ্রের চাপে দমে গেছে ঢাকা কেন্দ্রের বাঙলা গান।[১৬]

বর্ণনাটি নিঃসন্দেহে প্রতীকায়িত – স্বাধীনতাপূর্ব বাংলায় দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা ভাষার প্রতি অন্য দুটি ভাষার যে নিস্পেষণ তার ইঙ্গিত রয়েছে এখানে।

একমাত্র পুত্রের মুখনিঃসৃত কিম্ভুত-বিকৃত বাংলা ভাষা ব্যথিত করে জোহরা বেগমকে। একদিন রেডিওতে তিনি যখন বাংলা অনুষ্ঠান শুনতে ব্যস্ত তখন ছেলে আনোয়ার গিয়ে রেডিওর কাঁটা ঘুরিয়ে বিবিসির 'রক-এন-রোল' বাজনার সঙ্গে নাচ শুরু করে। জোহরা বেগম চিৎকার করে রেডিও বন্ধ করতে বলেন। এ প্রতিক্রিয়া মূলত প্রবাসী নারীর তীব্র মাতৃভাষাপ্রীতির পরিচয়বহ।

Dhaka University Institutional Repository

আবু ইসহাক ছিলেন যুগপৎভাবে সমাজসচেতন এবং সমকাল ও রাজনীতিমনস্ক কথাশিল্পী। তাঁর স্বদেশ-ভাবনা ও সংস্কৃতিবোধও ছিল গভীর। এ প্রতীতি এবং বোধের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। উপন্যাসের বৃহৎ ক্যানভাসে তিনি যেমন গণমানুষের সুখ-দুঃখ ও অস্তিত্বের লড়াইয়ের চিত্র এঁকেছেন, তেমনি ভাষা-আন্দোলনের অভিঘাত ও প্রতিক্রিয়া সমাজজীবনে কতটা প্রতিফলিত তা তিনি তাঁর দু'টি গল্পে রূপ দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। মূলত মাতৃভাষাভিত্তিক গল্প রচনার ভেতর দিয়ে কথাশিল্পী আবু ইসহাকের স্বদেশ ও সংস্কৃতি-অনুরাগ এবং মাতৃভাষাপ্রীতির গভীর অঙ্গীকার প্রকাশিত হয়েছে।

পল্লী-জীবন এবং পল্লী-মানুষের একনিষ্ঠ রূপকার আবু ইসহাক শাহরিক জীবন যে একেবারে বর্জন করেছেন তা নয়; তবে তাঁর রচনায় যে শহুরে জীবন তা মনোরম নয় বরং দীর্ণ, ক্লিষ্ট, রীতিমতো ভীতিকর।'বনমানুষ', 'ঘুপচি গলির সুখ', 'প্রতিবিম্ব' প্রভৃতি গল্পে শহরের জীবন-যন্ত্রণা এবং বিলাস-ব্যসনের প্রতি,পরোক্ষে সভ্যতার প্রতিই, কটাক্ষ করা হয়েছে।

'বনমানুষ' গল্পটির রচনাস্থল ৪৯, বেনেপুকুর লেন, কলকাতা। বস্তুত নাগরিক জীবনের যন্ত্রণা বর্ণনা করে এ গল্পে নগরকে এক হিংস্র জঙ্গলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এ গল্পের নগর হিংস্র জঙ্গলের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত। গল্পকথক দ্বিগুণ বেতনের লোভে সম্পূর্ণ অস্থায়ী একটি চাকুরিতে যোগ দেবার জন্য বনবিভাগের চাকরি ছেড়ে সদ্য কলকাতায় এসেছে অনেক স্বপ্ন নিয়ে। তার ভাষায় –

> বিয়ে করেছি অল্প দিন। এখন ডবল টাকার দরকার। তা ছাড়া জঙ্গল ছেড়ে এসেছি শহরে, হিংস্রালয় ছেড়ে লোকালয়ে, আঁধার ছেড়ে আলোকে। এরকম সভ্য সমাজে আসাটাও একটা মস্ত লাভ।[১৭]

অথচ চাকরিতে যোগ দেবার দ্বিতীয় দিনেই তার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা (এ গল্পে তার একদিনের অভিজ্ঞতাই বিবৃত হয়েছে) – তা তাকে বাধ্য করেছে দিনের শেষে এ কথা বলতে –

> চোখ বুজে ভাবছি – পদত্যাগ-পত্রটা প্রত্যাহার করার এখনো হয়তো সময় আছে। আমার জন্যে বন-বিভাগের চাকরিটাই ভালো। মানুষ তার মনুষ্যত্ব নিয়ে শহরে থাক। আমি বনে গিয়ে আবার বনমানুষ হবো।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

কতখানি ঘৃণা এবং যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এ উক্তিতে তা সহজেই অনুমেয়। তথাকথিত সভ্যতার নেতিবাচক দিকগুলোর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হলেই কেবল একজন মানুষ নগর ছেড়ে বনে গিয়ে বাস করাটাকে শ্রেয় মনে করে।

অভিমান করে নয়, সভ্যতার বিষবাষ্পে জর্জরিত মানুষের যন্ত্রণা, সমকালীন (দেশভাগের পূর্ববর্তী সময়ে) অস্থির, অনিশ্চিত, নিরাপত্তাবোধহীন নাগরিক জীবন এবং সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতা উপজীব্য হয়েছে এ গল্পের। এসব নাগরিক মানুষকে যন্ত্রণা দিলেও তারা বাধ্য হচ্ছে এরই মধ্যে জীবনযাপন করতে কিন্তু শহরে সদ্য আগত একজন মানুষ, যার আর কোথাও না হোক অন্তত বনে ফিরে যাবার একটা সুযোগ আছে সে কিছুতেই এই অসহনীয় যন্ত্রণায় জর্জরিত হতে চায় না, বরং গহীন বনের হিংস্র জন্তুর সান্নিধ্য তার কাছে অধিকতর শ্রেয় বলে বিবেচিত হয়। বনের পশুর হিংস্রতার চাইতে সে যেন মানুষ নামক কতিপয় পশুর হিংস্রতায় আজ বিমূঢ়, বিপর্যস্ত এবং বীতশ্রদ্ধ। একদিনের জন্য শহরে বের হয়েই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়ে ভীত নাগরিক চেহারাটা তার সামনে উন্মোচিত হয়। পথে বের হতেই ভয়, গল্পকথকের ভাষায় –

> পথ চেয়ে পথ চলি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি চেয়ে দেখতে হয় পথচারীদের পোশাকের দিকে। এই পোশাক ছাড়া কার কি ধর্ম জানবার উপায় নেই। কারণ ধর্মের কথা গায়ে কিছু লেখা থাকে না। সব ধর্মধারীদের চেহারাই মানুষের চেহারা। আমার চেহারা দেখে কিন্তু কারো বোঝার যো নেই আমার ধর্ম কি। কারণ আমার মানুষের শরীরটাকে আন্তঃধার্মিক পোশাকে ঢেকে নিয়েছি। তাই বলে কি আমি নিরাপদ? মোটেই না। আমার বিপদ বরং বেশি। আন্তঃধার্মিক পোশাকে মানুষের চেহারা হলেও যে কোন দিকের চাকু খাওয়ার ভয় আছে আমার। মুসলমান আমাকে হিন্দু ঠাওরালে, আর হিন্দু মুসলমান ঠাওরালেই হলো।[১৯]

কেবল যে প্রাণ-ভয়ে সন্ত্রস্ত নাগরিক চিত্র এতে আছে, তা-ই নয়, পাশাপাশি লেখকের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবও তার দার্শনিক প্রত্যয়ে উচ্চারিত হয়েছে। কোনো মানুষের গায়ে যে ধর্মের চিহ্ন নেই বা ধর্ম যে মানুষের মধ্যে প্রকৃত অর্থে কেনো বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে না – সবার উপরে যে কোনো ধার্মিক পরিচয় নয়, মানব পরিচয়ই প্রধান – চিরায়ত সত্যটি এ উক্তিতে নতুন প্রত্যয়ে আবারও উচ্চারিত হয়েছে নতুন সামাজিক প্রেক্ষাপটে, ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে। লেখক গভীর ঘৃণায়, ধর্মকে পুঁজি করে যারা সহিংসতার সৃষ্টি করেছে তাদের মানবমূর্তিকে অস্বীকার করে, ঘৃণিত পশু-চরিত্রে তাদের সৃজন করেছেন –

Dhaka University Institutional Repository

> কয়েক জনের মুখে শুনলাম , বাসের পা-দানির ওপর থেকে দু'জনকে দুপেয়ে শেয়ালে টেনে নিয়ে গেছে। আর অনেকের হাত-মুখ, নাক-কান ছিঁড়ে গেছে বোমার আঘাতে।[২০]

গল্পের মূলস্রোত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভীত এক নগর। কোট-প্যান্ট পরে, গলগ্রন্থিটা কোনরকমে বেঁধে নদীসম ছোট গলিটা নানা প্রতিকূলতায় কোনভাবে অতিক্রম করে বাসে বাদুরঝোলা হয়ে অফিস পর্যন্ত যেতে পারে না গল্পকথক; পরের স্টপেজেই ভিড়ের ধাক্কায় নেমে যেতে হয়। জীবন-রক্ষার্থে এক অ্যাংলো–ইন্ডিয়ান তরুণীর সহযাত্রী হয় সে। রাস্তায় পড়ে থাকা রক্তাক্ত মানুষ, ড্রেনে ভেসে যাওয়া রক্তের রাঙা স্রোত, চাকুর ভয়ে জামার নিচে লোহার তারের গেঞ্জি-পরা অফিসের সুবিধাবাদী মানুষের চরিত্র আঁকা সত্ত্বেও এসব কিছুই ভীত এক শহরের মানুষের মানবেতর জীবনকে প্রতিবিম্বিত করে।

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় যে, ১৯৬২ সালে 'হারেম' গল্পটি প্রথম নারায়ণ প্রিন্টিং প্রেস-এ ছাপা হলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় ঐ প্রেসে আগুন লাগানো হলে সব ফর্মা পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। লেখকের কাছেও বইটির কোনো কপি ছিল না, লেখাগুলো সংগ্রহ করে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় চৈত্র, ১৩৮৯ (১৯৮২ খ্রি.) সালে। 'বনমানুষ' গল্পের গল্পকথক দিন শেষে পৈতৃক প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরতে পারলেও আলোচ্য গল্পগ্রন্থটি রেহাই পায়নি সাম্প্রদায়িক আগুনের কবল থেকে।

'হারেম' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোতে আবু ইসহাক বিষয় হিসেবে সমকালীন সমাজ-বাস্তবতা এবং ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্নতাকেই নির্বাচন করেছেন। লেখক তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে সাধারণত গ্রামকে বেছে নিয়েছেন, সেক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি ব্যতিক্রম। হারেমের দুটি গল্প 'বোম্বাই হাজী' ও 'শয়তানের ঝাড়ু' ব্যতীত অন্য কোন গল্পে গ্রামীণ জীবনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থের গল্পগুলোর মৌল প্রবণতা মুসলিম সমাজের তথাকথিত ধর্মীয় সংস্কার ও অপব্যাখ্যার স্বরূপ উদ্ঘাটন। কেবল তাই জীবন-বিচ্ছিন্ন ধর্মীয় রীতি বা বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ করে কিছু গল্পে লেখক সংস্কার-মুক্তির ইঙ্গিত ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া রাজনৈতিক পটভূমিও এসেছে তাঁর 'বনমানুষ' গল্পে। 'পিপাসা' ও 'পণ্ডশ্রম' গল্পদু'টি একুশের চেতনাকে ধারণ করেছে – গল্পের বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় তা বিশ্লেষিত হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে লেখকের সমাজ-ভাবনার বিচ্ছুরণ দেখা যায় 'হারেম' গ্রন্থের প্রায় সব গল্পে।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় সংস্কারমুক্তি-বিষয়ক অধিকাংশ গল্পে লেখক মূলত স্যাটায়ারধর্মী ভাষা-রীতি গ্রহণ করেছেন। বিষয়ানুসারে এ রীতি অবলম্বন যথোপযুক্তই হয়েছে। 'হারেম' গল্পে রূপকধর্মিতা পাওয়া গেছে। অন্যান্য গল্পে প্রধানত বর্ণনাধর্মী রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। গল্পগুলো রচনায় সর্বজ্ঞ-দৃষ্টির ব্যবহার লেখকের মৌল দর্শনকে ধারণ করতে সফলতা পেয়েছে। কেবল তিনটি গল্পে – 'পণ্ডশ্রম', 'বনমানুষ' ও 'শয়তানের ঝাড়ু' লেখক উত্তমপুরুষ বা গল্পকথকের অভিব্যক্তি গ্রহণ করেছেন – যদিও এক অর্থে সেখানেও লেখক-সত্তা অনুপস্থিত নন তবুও কিছুটা ভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে বর্ণনাধর্মিতায়।

ছোটগল্পের সীমিত পরিসরে কাহিনীর মতো চরিত্রও বিস্তৃতি পায় না, তথাপি স্বল্প-পরিসরেও কোন চরিত্রের শক্তিশালী হতে বাধা নেই। কিন্তু 'হারেম' গ্রন্থের কোন গল্পেই তেমন উল্লেখযোগ্য শক্তিশালী কোন চরিত্র সৃষ্ট হয় নি। লেখকের ব্যক্তিগত দর্শন ধারণ করতে গিয়ে চরিত্র গুলো নিষ্প্রভ এবং দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং গল্পগুলো চরিত্র প্রধান না হয়ে থিম-প্রধান বিবেচিত হয়েছে। বিষয়ানুযায়ী ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা পাওয়া যায় আলোচ্য গল্পগ্রন্থে। অধিকাংশ গল্পেই লেখক চলিত ভাষা রীতির ব্যবহার করেছেন। আবার মাজারের খাদেম এবং পীর সাহেবের ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের আধিক্য দেখা যায়, যেমন –

> পীর সাহের তার কাধ চাপড়ে বলেন, 'তোমার ঈমান বহুত জয়ীফ। ঈমান পোক্ত কর। ইনশাল্লাহ আরাম হইয়া যাইব। আর যা যা বাতলাইয়া দিলাম ইয়াদ আছে তো? হররোজ গোছলের সময় হাতের তালুর উপর তাবিজখানা রাখবা। তারপর ঐ হাত দিয়া উডাইয়া তিন ঢোক পানি খাবা। [২৯]

চরিত্রানুযায়ী ভাষা ব্যবহারে লেখকের দক্ষতা এখানে স্পষ্ট। ভাষার ব্যবহারে এ গল্পগুলোতে উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার খুবই কম – প্রায় অনুপস্থিতই বলা চলে। প্রকৃতির প্রতীকী ব্যবহারও নেই একেবারেই। গল্পের ঘটনাতেই ইঙ্গিতধর্মিতার পরিচয় দিয়েছেন লেখক, সেহেতু এগুলোর অভাব খুব একট বোধ হয় না।

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী গল্পগুলোর আরম্ভ ও সমাপ্তি নাটকীয়। পাঠককে কৌতূহলী করে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখার কৌশল আবু ইসহাক জানতেন এবং এ গ্রন্থের গল্পগুলোতে তা প্রয়োগও করেছেন নির্দ্বিধায়। জীবনের নানা নেতিবাচকতাকে তুলে আনলেও অন্তিমে ইতিবাচকতারই ইঙ্গিত প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন গল্পকার। লেখকের ব্যক্তিগত জীবন-দর্শনের প্রতিফলনে স্বকাল-সংলগ্ন এই গল্পগুলো বাংলাসাহিত্যের ছোটগল্প ধারায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহাপতঙ্গ

'হারেম' (১৯৬২) প্রকাশিত হবার একবছর পরই আবু ইসহাকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'মহাপতঙ্গ' (১৯৬৩) প্রকাশিত হয়। এগারোটি গল্পের সংকলন 'মহাপতঙ্গ'-এর গল্পগুলো বিষয় ও আঙ্গিকে শৈল্পিক উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে। পূর্ববর্তী গল্পগুলোর তুলনায় এ গল্পে লেখকের জীবনদৃষ্টি এবং শিল্পকুশলতা অধিকতর পরিণত হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত 'জোঁক', 'মহাপতঙ্গ' প্রভৃতি রূপক গল্প বাংলা ছোটগল্পের ধারায় বিশিষ্ট সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

'মহাপতঙ্গ' গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলোতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মুসলিম সমাজের কূপমণ্ডকতা, শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব এবং বৈশ্বিক অশান্তি প্রভৃতি বিষয় হিসেবে এসেছে। নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি লেখকের পূর্বাপর মমত্ববোধ এ গ্রন্থেও লক্ষণীয়। কোনো অলীক কাহিনী কিংবা রোমান্সের মধুর আবেশ নয়; আবু ইসহাক অতি চেনা জীবনের কঠোর বাস্তবতাকেই বারবার গল্পের উপজীব্য করেছেন এবং বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে তিনি শিল্পসফলতাও লাভ করেছেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতার চিত্র পাওয়া যায় লেখকের 'মহাপতঙ্গ' গল্পগ্রন্থের 'বিস্ফোরণ' গল্পে। হিংস্র পশু নয়, হিংস্র মানুষের ভয়ে স্বামী-স্ত্রী শিশু মেয়ে নিয়ে শণক্ষেতের মধ্যে লুকিয়েছিল। সেখানে সন্ধ্যা থেকে রাত দুপুর অবধি তারা নিশ্চল পড়ে থাকে। শিশু মেয়েটা কেঁদে সর্বনাশ ঘটাবে এই ভয়ে পরীবানু তার স্তনবৃন্ত ওর মুখে পুরেই রাখে সর্বক্ষণ। কিন্তু তবু মেয়েটা মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে। ইয়াসিনের রাগ ধরে। কাঁদবার জন্য মুখ হা করবার সাথে সাথে সে ওর কচি মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে আর বিড় বিড় করে গাল দেয় – "মেকুরের বাচ্চাডারে দম ফাঁপড় কইর‍্যা মাইর‍্যা ফ্যালাইমু।"[২২] তা সত্ত্বেও গল্পটির কাহিনীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয়, বরং শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব প্রাধান্য পেয়েছে।

শোষিত নিপীড়িত মানুষের রূপকার কথাশিল্পী আবু ইসহাক তাঁর লেখায় শোষিত মানবাত্মার নিষ্করুণ আর্তনাদই কেবল নয়, তাদের ক্ষোভের বিস্ফোরণও দেখিয়েছেন প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। প্রথাগত নব্য ধনী গ্রাম্য জোতদার পৌঢ় আতাউল্লাহ্ খাঁ কেবল পায়ের পাতা দেখেই কন্যাসম পরীবানুকে নিয়ে রঙিন

Dhaka University Institutional Repository

স্বপ্ন বুনেছিল। ছলে-বলে-কৌশলে যখন সে নিজ কর্মচারী ইয়াসিনের বাগদত্তা পরীর মুখদর্শন করে, তখন –

> আতাউল্লাহ্ খাঁর চোখ যেন ঝল্‌সে যায় সে রূপে। তাঁর ভাটি বয়সের নিস্তরঙ্গতায় যৌবনের হিল্লোল জাগে।[২৩]

নানা কৌশলে সে ইয়াসিনকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে বিয়ে করা থেকে, জাত-বিভেদের যে যুক্তি সে ইয়াসিনকে দেয়, তা তার নিজের বেলাতেই যে প্রযোজ্য নয় তার উল্লেখ করতেও ভুল করে না –

> এটা তোর পয়লা বিয়ে। তুই কেন পয়লা কলুর ঘরে বিয়ে করতে যাবি? আমাদের মত হলে আলাদা কথা ছিল। এই ধর আমার কথা। পয়লা বিয়ে গাজীপুরের মীর বংশে। দোসরাটা তার চেয়ে একটু নিচে মজুমদার বংশে। এখন যদি তেসরা চৌথা বিয়ে কলু–নাগারচির ঘরেও করি তবুও দুষতে পারবে না কেউ। কারণ বিয়ে বলতে পয়লাটাই লোকে ধরে, শেষের গুলোত –[২৪]

ইয়াসিন এ বিয়ে ভাঙ্গতে অস্বীকার করলে তাকে চাকুরিচ্যুতই কেবল করা হয় না; নৌকা ডুবিয়ে তাকে মারার চেষ্টাও করা হয়, তবুও এই নব-প্রণয়ী যুগলকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয় না। অর্থের দাপটের চাইতে প্রণয়ের শক্তির যে মাহাত্ম্য চিরকালীন তা আবারও স্বমহিমায় উম্মোচিত হয়। 'চোরাকারবারের টাকা ঢেলে দৌলত মইশালকে হাত' করতে পারলেও তার মেয়ে পরীবানু আতাউল্লাহ্ খাঁ-এর হস্তগত হয় না –

> বিয়ের আগের দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই তিনি খবর পান-পরীবানু পালিয়েছে। কার সাথে পালিয়েছে বুঝতে বাকী থাকে না তাঁর।[২৫]

প্রতারিত, অপমানিত আতাউল্লাহ্ তার পরাজয়ের আক্রোশ চরিতার্থ করার সুযোগ পায় পাঁচ বছর পর যখন তারই লঞ্চে ভাড়া দিতে অসমর্থ হয়ে রায়টে তাড়িত পরীবানু-ইয়াসিন তার দয়াপ্রার্থী হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। সেই দুষ্টক্ষণে আতাউল্লাহ্ ভাড়া খোঁজার অজুহাতে পরীর গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করলে ইয়াসিন তার 'বৈঠাটানা, মাটিকাটা পেশীবহুল শরীরের' সমস্ত শক্তি একত্র করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রয়োজনবোধে দুর্বলের ইচ্ছেশক্তির কাছে প্রবল যে শোচনীয়ভাবে পরাভূত হয়, ইয়াসিন একটি অসুরের কবল থেকে তার পত্নীকে রক্ষা করে তার প্রমাণ দেয় এ গল্পে। লেখক বিষয়টি পুরাণের অনুষঙ্গে চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন –

Dhaka University Institutional Repository

> ইয়াসিন তার বুকের ওপর চেপে বসে। দুরাত্মা দুঃশাসনের বক্ষ বিদারণ করে ভীম তার রক্ত পান করবে বুঝি।[২৬]

মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কারণে দুঃশাসনের বুক চিরে যেমন ভীম রক্তপান করেছিল, সেই ভীমের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে খেটে খাওয়া মজুর ইয়াসিন তার নিগ্রহের যথোচিত প্রতিবাদ করতে পেরেছে। প্রণয়ের নিকট অর্থের পরাজয় যেমন 'বিস্ফোরণ' গল্পে দেখা যায়, তার বিপরীত-চিত্রও পরিলক্ষিত হয় 'আবর্ত' গল্পে। আবু ইসহাকের শিল্পীমন প্রধানত শোষিত মানুষের জীবনের রূপায়ণেই অধিক দক্ষ, সে-কারণে কখনও কখনও তাঁর গল্পে রোমান্টিক ভাবের উদ্দীপনা দেখা গেলেও তার আড়ালে মানবজীবনের ট্র্যাজিক দিকগুলোই প্রধানত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'আবর্ত' শীর্ষক গল্পে পল্লীর চাষী-পরিবারের দুই যুবক-যুবতীর প্রেমের বিষয়কে লেখক ট্র্যাজেডির আবহে রূপদান করেছেন।

দুর্ভাগ্যের শিকার ইউনুস পিতৃসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে ভূমিহীন চাষীতে পরিণত হয়। অনেক চেষ্টা করে সে তার চাচা ওমর আলী মোড়লের এক টুকরো জমি চাষ করার অনুমতি পায়। এই চাষীর ছেলেটির সঙ্গে গাঁয়ের লোকমান ফরাজীর মেয়ে নূরজাহানের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগা ইউসুফের সুখের তরী তীরে ভেড়ে না। ইউনুসের অভিভাবক হয়ে তার চাচা ওমর আলী মোড়ল পাত্রী দেখতে গিয়ে ইউনুসকে দেওয়া জমিটা লোকমানকে লিখে দিয়ে তার মেয়ে নূরজাহানকে নিজেই বিয়ে করে ঘরে তোলে। এই নির্মম বিশ্বাসঘাতকতায় ইউনুস হতভম্ব হয়ে যায়। একসময় 'ভালোবাসার যে দুটি লতা জড়াজড়ি করে বেড়ে ওঠে পাটক্ষেতের আড়ালে', মানুষের নিষ্ঠুরতা তাকে সমূলে উৎপাটিত করে সমাজে লোভ-লালসার আর একটি নিদর্শন রাখে। নূরজাহান মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে মানুষের হৃদয়হীনতার চক্রান্তে নদীগর্ভে সলিল সমাধি লাভ করে।

পল্লী জীবনের রূপচিত্র নির্মাণে লেখকের সার্থকতা সমালোচকের ভাষায় নির্দেশিত হয়েছে এভাবে –

> পল্লীর লোকজীবনের এই কাহিনীতে লেখক যে বিষাদময়তা সৃষ্টি করেছেন, স্বভাবতই তা জসীমউদ্দীনের আখ্যানমূলক কাব্য, 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কিংবা 'নক্সীকাঁথার মাঠে'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আবু ইসহাক এ ধরনের কাহিনীর অন্যতম সফল রূপকার।[২৭]

বস্তুত জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তবতা আবু ইসহাককে বহুলভাবে আকর্ষণ করে। আর সে বাস্তবতাও পল্লীর অজ্ঞাতকুলশীলদের জীবন-যন্ত্রণার বিষয় নিয়ে সজীবতা লাভ করেছে এ গল্পে। দাদার মৃত্যুর

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকঘণ্টা আগে কলেরায় বাবার মৃত্যু ঘটায় মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের বিধানে বাপ-দাদার সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় ইউনুস। কয়েক ঘণ্টা পর বাবা মারা গেলে যে অধিকারী হতে পারতো বিশাল সম্পত্তির, নিছক ভাগ্যদোষে তাকে অন্যের জমিতে কামলা খেটে খেয়ে না-খেয়ে দিন কাটাতে হয়। তার নিয়তিতাড়িত জীবনযন্ত্রণার এরূপ রূপায়ণ বাংলা কথাসাহিত্যে একেবারে বিরল নয়, তবে খুব সুলভও বলা যাবে না। অন্যদিকে একাধিক বিয়ের বা ধনী বৃদ্ধ যে কি-না মৃত্যুশয্যায় পড়ে ছিল সে যে কোনরকমে বিছানা ছেড়ে উঠেই বিয়ের জন্য পাগল হয়ে গেল – এ ধরনের কাহিনীও গ্রাম-বাংলায় একেবারেই বাস্তব, কল্পনা নয়। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের বহু কাহিনী লেখা হয়েছে (প্রসঙ্গত কমলকুমার মজুরদারের 'অন্তর্জলি যাত্রা'র উল্লেখ করা যেতে পারে) এবং হচ্ছে কিন্তু এই নিদারুণ বাস্তবতার কোন পরিবর্তন আজও দেখা যায় নি।

বিষাদময় প্রেম-কাহিনী বা গ্রামীণ সমাজের অনাচারই কেবল নয়, যুগ যুগ ধরে গ্রাম-বাংলায় নারীর অবমূল্যায়নের যে ধারা প্রবাহিত রয়েছে তাও এ গল্পে স্থান পেয়েছে, এভাবে –

> সাজু বিবি বুঝতে পারে সব। আগেই সে বুঝেছিল এবং বলেও ছিল স্বামীকে। কিন্তু লোকমান ফরাজী তার কথায় কান দেয় নি। মেয়েলোকের কথায় কোন্ পুরুষই বা কান দেয়? তার কাছে মেয়ে কিছু নয়। এক কানি জমিই বড়।[২৮]

'আইয়ামে জাহেলিয়াতের' যুগে নয়, এ যুগেও কন্যাশিশু গ্রামীণ সমাজে প্রত্যাশিত নয়, 'মেয়ের চেয়ে জমি বড়' – এ কথা বাস্তব এ সমাজে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মেয়েদের বোঝা বলেই তো মনে করা হয়। সুন্দরী হলে মেয়ে হয়ে ওঠে বিনিময়যোগ্য পণ্য বিশেষ। তবে কোন ক্ষেত্রেই তাদের মতামতের তোয়াক্কা করা চলে না। স্নেহ-বাৎসল্য, মায়া-মমতা বিবর্জিত গ্রাম-বাংলার এই নির্মম রূপ প্রকৃতির সুনিবিড় স্নিগ্ধতার আড়ালে চাপা পড়েই থাকে – কখনও বীভৎস হয়ে আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না, আমাদের প্রতিবাদী বা বিদ্রোহী করে তোলে না, কেবল সাময়িক কিছু যন্ত্রণার সৃষ্টি করলেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ধ্বজা সমুন্নত থাকে।

ধর্মের লেবাসে সমাজের ভণ্ডামির বাস্তব রূপায়ণ দেখা যায় 'খুতি' নামক গল্পে। এ গল্পের প্রধান চরিত্র আকবর সাহেব ম্যারেজ রেজিস্ট্রার মৌলভী। একদিকে তিনি নামাজ-রোজায় খুবই পোক্ত, অন্যদিকে আবার ঘুষ খাওয়ায় অভ্যস্ত। তিনি নিজে ঘুষ খেতেন তার প্রমাণ অপ্রত্যক্ষভাবে হলেও পাওয়া যায় এ গল্পে –

Dhaka University Institutional Repository

"এই গরমে কাপড় চাই রসুনের চোকলার মত পাতলা। জিজ্ঞেস করে দেখ জুলুর বাপকে। ওদের ছেলেবেলায় কেমন জামা-কাপড় দিয়েছি। সিল্কের পাজামা-পাঞ্জাবী পরে, জরীর টুপি মাথায় দিয়ে ওরা যখন বেরুতো তখন লোকে চেয়ে থাকত। বলাবলি করত নিজেদের মধ্যে, ছেলে বটে কাজী সাহেবের। কী আর বলব মা, সাবরেজিষ্ট্রারের ছেলেরা পর্যন্ত ওদের কাছে হট খেয়ে যেত সাজ-পোশাকে।"[২৯]

কেবল বৈধ আয় দিয়ে একজন ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার যে কোনভাবেই একজন সাবরেজিস্ট্রারকে টেক্কা দিতে পারে না তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া পুত্রবধূ হালিমার কাছে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তার বাবা তার জন্য কিছুই রেখে যান নি, অথচ তিনি এক দ্রোণ জমি, বাড়ি-ঘর করে ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন; তার স্বল্প আয়ে এসব যে সম্ভব নয় – তা বোঝা যায় সহজেই। অথচ এই আকবর সাহেব নামাজ রোজায় গাফলতি একদম সহ্য করেন না। ঘুষ খেতে না বাঁধলেও বেনামাজীর হাতের খাবার খেতে তার বাঁধে। প্রসঙ্গত –

মোরগ ধরার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তিনি হালিমাকে বলেন, ওসব চাকর-বাকরের জবাই করা মোরগ আমাকে খাওয়াতে পারবে না, মা। ওরা না জানে দোয়া-কালাম, না জানে ওজু-গোসল, নামাজ দূরে থাক কেব্‌লাই চিনে না। এসব বেনামাজীর জবাই গোশত হালাল হয় না।[৩০]

এত যার ধর্মজ্ঞান সে কি না খুতি বেঁধে ঘুষের টাকা আনতে যায় তার ছেলেদের বাড়ি। ইনকামট্যাক্সের অফিসার বড় ছেলে ও ওভাসিয়র ছোট ছেলের আয়-উন্নতিতে সে ভীষণ খুশি হলেও মেজো ছেলে পুলিশের দারোগা আফজল ঘুষ খায় না বলে ভীষণ বিরক্ত। ধর্মের বাহ্যিক লেবাস অঙ্গে ধারণ করলেই যে প্রকৃত ধার্মিক হওয়া যায় না – লেখকের এই গভীরতর উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায় এ গল্পে। তিনি কঠোর নামাজী ঘুষখোর আকবর সাহেবের বিপরীতে নামাজে গাফলতকারী তারই সন্তান দারোগা আফজলকে স্থাপন করেছেন যে কিনা চাকুরির বাঁধা মাইনেতে কষ্টে সৃষ্টে জীবন ধারণ করছে সমস্ত প্রলোভন উপেক্ষা করে কিন্তু অনৈতিকতার স্পর্শ গায়ে লাগতে দেয়নি। বস্তুত লেখকের মৌল উদ্দেশ্যই যে এ গল্পে চিত্রায়িত হয়েছে লেখকের উক্তিতেই তার প্রমাণ মেলে –

মানুষ যে মানুষ হিসেবেই পরিচিত হতে চায়, ধর্মের হিসেবে নয় – সে কথাটা অনেকেই মানেন না। আমার লেখালেখিতে বর্তমান সময় তো এসেছেই, এসব ভণ্ডামির বিরুদ্ধেও ইঙ্গিত লক্ষ করবেন।[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থলোলুপতা এবং অনৈতিক উপার্জন মানুষের মানবিকতাকে ক্ষুণ্ন করে অথচ মানবিক এবং সামাজিক সব সম্পর্কও যে নিরূপিত হয় অর্থের মানদণ্ডে, তা এই আকবর সাহেবকে দিয়ে ভালই বোঝা যায়। তাইতো দুর্ভিক্ষে প্রতিবেশী কিতাবালীকে দশ মন ধান দিয়ে যে জাল বিছিয়েছিল সে – আজ তা পুষিয়ে নিতে চায় তার জমি গ্রাস করে। কিতাবালীকে বাধ্য করে তার একাকানি জমি লিখে দিতে, এ ব্যাপারে তার বিবেক একটুও বাধে না বরং সন্তানদের জন্য একটি টুকরো সম্পত্তি করতে পেরে মনে মনে উল্লসিত হয়। এ গল্প সম্পর্কে লেখকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য –

> এক সাহিত্যসভায় আমি 'খুতি' নামে একটা গল্প পড়েছিলাম।...কয়েকজন আলোচক গল্পটির বিরূপ সমালোচনা করে বললেন একজন মৌলবি সাহেবকে এভাবে চিত্রিত করা উচিত হয় নি । কবি তালিম হোসেন বললেন, 'আমাদের সমাজে ধর্মের ধ্বজাধারী এমন বহু লোক আছে যারা ধার্মিকের ছদ্মাবরণে অপকর্ম করতে দ্বিধা করে না। এরকম লোকদের মুখোস খুলে দেওয়া দরকার। 'খুতি' গল্পে এমনি একজনের মুখোস খুলে দেয়া হয়েছে। একজন সত্যিকার ধার্মিক লোকের সৎ কাজের প্রশংসা করে আরেকজন গল্প লিখতে পারেন। সমাজের আসল রূপ এভাবেই আমাদের সাহিত্যে উন্মোচিত হওয়া উচিত। [৩২]

সমাজের রূপ উদ্‌ঘাটনই প্রকৃতপক্ষে লেখকের অভীষ্ট। Art of Art Sake–এর অনুসারী না হয়ে, Aesthetic সাহিত্যের বিশুদ্ধ নির্মাণে গণ্ডিবদ্ধ না থেকেও আবু ইসহাক তাঁর গল্পে, তাঁর লেখায়, তাঁর স্মৃতিচারণে একনিষ্ঠভাবে সমাজের রূপায়ণে লেখনী ধারণ করেছেন। সমাজের অসঙ্গতি নির্মাণে ধর্মের প্রতি নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় তিনি দিয়েছেন, বাংলা কথাসাহিত্যে একমাত্র সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র রচনাতেই তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায়। 'চাঁদের অমাবস্যা'-র কাদের দরবেশ এবং 'খুতি' গল্পের আকবর সাহেবের মধ্যে একধরনের মিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উভয়েই লোকচক্ষে ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ হলেও প্রকৃতপক্ষে জীবনে অধর্মাচরণকেই ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে। আবার 'লালু সালু' উপন্যাসের কপট ধার্মিক মজিদের ছায়াও কি আমরা সামান্য হলেও দেখতে পাই না আকবর সাহেবের মধ্যে?

'বংশধর', 'বর্ণচোর' – উভয় গল্পেই পুত্রসন্তান লাভের আনন্দ ও বংশ রক্ষার স্বস্তি এবং সেই সঙ্গে একধরনের বিষাদও দানা বেঁধে উঠেছে। 'বংশধর' গল্পে মালেক চৌধুরীর একমাত্র পুত্র খালেক চৌধুরী ছয় কন্যা সন্তানের পর একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। অসুস্থ মৃতপ্রায় মালেক চৌধুরী বংশধর

Dhaka University Institutional Repository

লাভের সংবাদে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন এবং একবার নাতির মুখ দেখবার জন্য প্রাণপণে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখেন কিন্তু তার আশা পূরণ হয় না। নাতি দাড়িওয়ালা বুড়ো দাদুর সঙ্গে চিড়িয়াখানার সিংহের অদ্ভুত সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। অন্ধ দাদু নাতিকে কোলে নিয়ে সাধ পূরণ করার আগেই বালিশে মুখ থুবড়ে পড়ে ইহলীলা সাঙ্গ করে। বিষাদাত্মক কাহিনীর মধ্যে একটা স্যাটায়ারও আছে। বংশ রক্ষার জন্য চৌধুরী পুত্রকে দ্বিতীয়বার বিয়ে পর্যন্ত করাতে চেয়েছেন – চতুর্থবার কন্যা সন্তান হবার পর; শিক্ষিত ছেলে রাজী হয় নি। ছয়টি সন্তান – হোক কন্যা সন্তান – চৌধুরী সাহেবের বাঞ্ছিত নয়। কেবল একটি নাতি – বংশের চেরাগের জন্য তার অপেক্ষা কিন্তু নাতির কাছে এহেন পক্ষপাতদুষ্ট দাদা যে আকাঙ্ক্ষিত নয়, তারই প্রমাণ যেন এ গল্পে আমরা পাই। 'বর্ণচোর' গল্পেও শফীউল্লাহ সাহেবের বাবা মায়ের পুত্রসন্তান আকাঙ্ক্ষার সন্ধান পাওয়া যায়। বিপত্নীক শফীউল্লাহ অবাঙালী একটি মেয়েকে বিয়ে করলেও তার বাবা মা বংশরক্ষার সম্ভাবনায় প্রীত হন এবং নাতি হবার পর তাকে দেখতে আসেন নানা জিনিসপত্র নিয়ে। যদিও গল্পের মূল স্রোত এদের ঘিরে নয়, আঠারো উনিশ বছরের সুন্দরী তরুণী শাকিলা, বিপত্নীক অর্থবান শফীউল্লা-র অগোচরে সমবয়সী আসিফের সন্তানই যে ধারণ করেছে তার গর্ভে এ ব্যাপারটি গল্পকার ইঙ্গিতে প্রকাশ করে গল্পের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। অসম বিয়ের নেতিবাচক দিক এ গল্পের উপজীব্য।

বাৎসল্য-প্রীতি যে অমানবিকতা থেকে গভীর মানবিকতায় মানুষের উত্তরণ ঘটায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'উত্তরণ' গল্পে। এ গল্পে লেখক এক দুধওয়ালার হতভাগ্য জীবনের কাহিনী বিবৃত করেছেন। রুস্তমের বাড়ি সীমান্তের কাছাকাছি দর্শনায়। তার দুটি দুধাল গাই বাছুর সমেত সীমান্তের স্মাগলার চালান করে নিয়ে যায়। তারপর থেকে দুধের এক ধরনের ফটকা ব্যবসা করে সে জীবন ধারণ শুরু করে। সামান্য কেরানি শ্রেণীর বাড়িতে দুধের যোগানদার এই রুস্তমের সরবরাহিত দুধে পানি আর গুড়ো দুধের মিশ্রণ ধরতে পারলেও দরিদ্র কেরানির পক্ষে সব বকেয়া শোধ করে তাকে ছাড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয় – এ প্রত্যয়ই রুস্তমকে আরও সাহসী করে তোলে কিন্তু একদিন এক শিশুর কান্না তাকে তার মৃত সন্তানের স্মৃতি জাগিয়ে দেয়। সে পারে না এই পুত্রসম শিশুর মুখে ভেজাল দুধ তুলে দিতে। তার এ উত্তরণের ছবি এঁকেছেন লেখক এভাবে –

> শিশুটি কাঁদছে ওয়া ওয়া হাত পা নাড়ছে। ছোট্ট হাত-পা। কচি কচি মুখ-চোখ-কান। সেই একই রকম সব কিছু। রুস্তম দোলনার পাশে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে। তার স্মৃতির তারে এবার

Dhaka University Institutional Repository

কে যেন ঘন ঘন ছড় টেনে চলেছে। বারান্দায় টেবিলের ওপর খালি একটা দুধের বোতল। বোতলের মুখে চুষনি।

রুস্তম আর দাঁড়াতে পারে না। দুধের কলসী নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।

ওয়া ওয়া।

মানব-শিশুর এ কান্না রুস্তমের বুকের মধ্যে যেন বাসা বেঁধেছে।

অনেকদিন পর আজ আবার রাস্তার তে-মাথায় গিয়ে দাঁড়ায় রুস্তম। তার কলসী খালি। কলসীর মুখে গামছা নেই। [৩৩]

রুস্তমের এ উত্তরণে তথাকথিত ছোটলোকদের প্রতি আবু ইসহাকের দরদের প্রকাশ ঘটেছে এবং সেই সঙ্গে সমাজের অসৎ ব্যবসায়ী শ্রেণীর মানবিকতা বোধের উত্তরণও কামনা করা হয়েছে।

হালকা ধাঁচে হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত হলেও 'সাবীল' গল্পে তথাকথিত ধর্মীয় প্রথার অসারতা এবং দরিদ্র বস্তিবাসীর প্রতি লেখকের মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মহরমের সময় করাচীর সমাজে সাবীল তৈরির প্রথা প্রচলিত। মহরমের স্মৃতি উজ্জীবিত করতে সে সময় পানি সরবরাহ একটি পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হয়। এ গল্পে আজফার সাহেবের নিঃসন্তান স্ত্রী এই পুণ্যের লোভে নিজ খরচে বাড়ির সামনে সাবীল তৈরি করেন। প্রতিবেশীদের কাছে থেকে প্রশংসা পাওয়াই তার মূল লক্ষ্য। বাড়ির সামনে আর একটি সাবীল তৈরি হওয়ায় বাতাসা, বরফ, গোলাপ জল প্রভৃতি কিনে বেশি লোক টানার প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। মহরমের দিনগুলো পার হলে গোলাপ সুগন্ধী মিশ্রিত পরিত্যক্ত পানিতে এক সময় ঝাঁকে ঝাঁকে মশা উৎপন্ন হয়ে আক্রমণ করে গৃহকর্ত্রীকেই । পুরো ব্যাপারটিতেই প্রকৃতপক্ষে লেখকের শ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। পুণ্যলাভের লোভে যে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে মহরমের সময় সাবীল বসিয়ে তৃষ্ণার্ত মানুষদের তৃষ্ণা নিবারণের পন্থা উদ্ভাবন করে, সে যখন পাঠান বস্তির দরিদ্র মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য পানি সংগ্রহে বাধা দেয় বাথরুম নোংরা হয়ে যাওয়ার ভয়ে তখন বৈপরীত্যটা স্পষ্টতই বোঝা যায় এবং ধর্মাচরণের লৌকিক অনুষ্ঠানের বিপরীতে ধমীয় বোধের অন্তঃসারশূন্য চেহারাটাই উন্মোচিত হয়।

রঙের কনট্রাস্ট ভাবতে ভাবতে যাদের দিন কাটে সেই চিত্রশিল্পীরা যদি কখনও সমাজ বা নিজ পরিবারের দিকে তাকান, অদ্ভুত কনট্রাস্টের সন্ধান পান হয়ত নিজ গৃহেই । আবু ইসহাকের

Dhaka University Institutional Repository

'কনট্রাস্ট' গল্পের শিল্পী খুরশীদের চোখে তেমনি ধরা পড়েছে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত দুই নারীর ভেতরকার গভীর বৈপরীত্য – একজন সুন্দর, অন্যজন অসুন্দর; একজন কর্মবিমুখ অন্যজন প্রাণান্ত পরিশ্রমে চালিয়ে নেয় পুরো সংসার; দয়া মায়া বা আবেগ-বিবর্জিত নারীর বিপরীতে নিম্ন বিত্তের নারীর মাঝে শিল্পী খুঁজে পান গভীর মমতা বা আবেগের উৎসরণ।

নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীর বিড়ম্বনা এবং পোশাক-বাহুল্যের অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় আবু ইসহাকের 'প্রতিবিম্ব' গল্পে। অফিসে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত বড়ো কর্তার নির্দেশে এবং চাকুরি হারানোর ভয়ে গল্পকথক শাল-পাঞ্জাবী ছেড়ে কোট-প্যান্ট ধরতে বাধ্য হন। স্বল্প আয়ের কেরানির পক্ষে চাকুরির সামান্য টাকা বাঁচিয়ে ভিক্টোরিয়া পার্কের পুরোনো দোকান থেকে কোট-প্যান্ট কেনা ব্যতীত কোন গত্যন্তর থাকে না। সেই পুরনো কোটের পকেট থেকে কোটের প্রাক্তন মালিকের এক মর্মান্তিক চিঠি আবিষ্কার করেন গল্পকথক। চিঠিতে কোর্টের আগের মালিক জনৈক নূর মোহাম্মদ মনসুর নামক কোনো এক ব্যক্তিকে কোট কেনার ইতিহাস শোনায়। সরকারী অফিসের বড়োকর্তা নিয়ম অনুযায়ী এক বছর পর পর বদল হন। বস্তুত দু'এক বছর পর পরই নতুন নতুন মন–মানসিকতা ও মর্জি নিয়ে আবির্ভূত হন নতুন নতুন কর্মকর্তা এবং তাদের মেজাজ-মর্জি অনুযায়ী ঘন ঘন পাল্টাতে হয় অফিসের কর্মচারীদের আচার-আচরণ-পোশাক। এসূত্রে নূর মোহাম্মদকে জামা ছেড়ে শেরওয়ানী, শেরওয়ানী ছেড়ে কোট পরিধান করতে হয়। একদিন অন্য এক চীফ ম্যানেজারের আবির্ভাব হয়। স্টোর-কীপার স্যুট পরিহিত নূর-মোহাম্মদকে দেখে সন্দিহান চীফ ম্যানেজার ভাবেন –

> পাঁচ পাঁচটা মানুষের ভার বহনকারী একশো টাকা মাইনে স্টোর-কীপার এই মাগগী-গণ্ডার বাজারে চুরি না করে স্যুট হাঁকায় কেমন করে।[৩৪]

অতএব অচিরেই নূর মোহাম্মদ প্রথমে বদলি, পরে ছাটাই হন অফিস থেকে। অতঃপর অনাহারে অর্ধাহারে যক্ষ্মায় অনিবার্য মৃত্যুর ইঙ্গিত। এই নির্মম কাহিনী ভাবান্তর জাগায় গল্পকথকের মনে। লোক দেখানো মানসিকতা, পোশাকের জৌলুশ এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তার খেয়াল-খুশির যাঁতাকলে পড়ে কত যে হতভাগ্য অকালে প্রাণ হারাচ্ছে তারই যথার্থ প্রতিবিম্ব এ গল্প।

আবু ইসহাকের ছোটগল্পের বিষয় সমাজজীবন,সভ্যতা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য। তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রূপকধর্মিতা। এ পর্যায়ের সবচেয়ে সার্থক গল্প 'জোঁক', ও 'মহাপতঙ্গ'। জোঁক যেমন নীরবে মানুষের রক্ত চুষে খায়, ভূমিহীন মানুষের শ্রমের ফসলও তেমনি চুষে খায় মহাজন। তবে এ গল্পে

Dhaka University Institutional Repository

কেবল শোষণ নয়, প্রতিবাদী মানুষের চিত্রও এসেছে। ওসমান যখন মহাজনের উদ্দেশ্য বলে, "রক্ত চুইষ্যা খাইছে। অজম করতে দিমু না।"[৩৫] – তখন শোষিত নিপীড়িত চাষীদের অভ্যুত্থানের ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। এ গল্পে সুস্পষ্টভাবে তেভাগা আন্দোলনের উল্লেখ রয়েছে –

> ইউসুফ ক্রুর হাসি হেসে বলেন তে-ভাগা! তে-ভাগা আইন পাস হওয়ার আগে থেকেই রিহার্সাল দিয়ে রাখছি।
>
> সিগারেটে একটা টান দিয়ে আবার সে বলে আইন! আইন কবে কি করে আমাদের আটকাতে পারে! আমরা সুচের ফুটো দিয়ে আসি আর যাই! হোক না আইন। কিন্তু আমরা জানি, কেমন করে আইনকে 'বাইপাস' করতে হয়। হুঁহু, হু।[৩৬]

এ উক্তির মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের মহাজন শ্রেণীর চিরন্তন চিত্র ধরা পড়ে। নিরন্তর উপবাস ও অমানুষিক শ্রমে উৎপন্ন ফসলে কলে-কৌশলে জোঁকের মত ভাগ বসায় এই মহাজনেরা এবং অসহায় কৃষককুল নীরবে অশ্রুপাত করে – এটিই স্বাভাবিক চিত্র, তবে এক্ষেত্রে এ চিত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছে – কেবল অসহায় আত্মসমর্পণ নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেছে কৃষকেরা।

চাষীদের পাটকাটার সময়ে এ গল্পের সূচনা। পচা পানির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সারা গায়ে তেল মেখে ওসমান তার বর্গা পাওয়া জমির পাটকাটার জন্য একবুক পানিতে ডুবে ডুবে পাট কেটে আনে। পচাপানির জোঁক একসময় তার পায়ে আঠার মত লেগে রক্ত চুষে খেতে থাকে কিন্তু সে টের পায় না। তার ছেলে তোতা বাপকে দেখালে সে কাস্তে দিয়ে দুটুকরো করে প্রাণীটিকে। কদাকার এই রক্তচোষা প্রাণীর সঙ্গে ওসমান আশ্চর্য মিল খুঁজে পায় শোষক মহাজন শ্রেণীর – যারা তার এত পরিশ্রমের ফসলে ভাগ বসায়, কলমের খোঁচায় সাদা কাগজে কি সব লিখে রেখে টিপসই নেয় এবং ফসল উঠলে সে টিপসইয়ের জোরে মিথ্যে ঋণ দাখিল করে কৃষকের শ্রমের ফসল কেড়ে নেয়, যদি না কৃষকেরা তা প্রতিহত করতে একতাবদ্ধ হয়। 'মহাপতঙ্গ' গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। বাংলার তেভাগা অভ্যুত্থান মূলত চল্লিশের দশকে উত্তাল হয়েছিল – একটু দেরীতে হলেও সেই উত্তাল কৃষককুলকে লেখক তাঁর লেখনীতে ধারণ করে সমাজনিষ্ঠতার পরিচয়ই ব্যক্ত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'মহাপতঙ্গ' গল্পে চড়ুই পাখির জবানীতে একদিকে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ, অন্যদিকে ধ্বংসাত্মক রূপ বিবৃত করেছেন লেখক রূপকধর্মিতায়। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সৃষ্টি 'বিমান' চড়ুই পাখিদের নিকট মহাপতঙ্গ বলে পরিচিত; আকাশে উড়ে বেড়ানো সকল পাখির মধ্যে এটিকে সর্ববৃহৎ ও বিস্ময়কর বলে মনে হওয়ায় এ নামকরণ। পুরুষানুক্রমে এরা প্রত্যক্ষ করে মহাপতঙ্গের বিচরণ ও কর্মকাণ্ড। বন্যার সময় যখন মহাপতঙ্গ বন্যা-পীড়িত দুর্গত মানুষদের উদ্ধারকার্যে এগিয়ে আসে, বন্যা-পরবর্তী দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় খাদ্য-সামগ্রী বয়ে আনে – চড়ুইপাখিরা একে মহা-উপকারী পতঙ্গ বলেই মনে করে কিন্তু সেই একই বিমান যখন জনবসতির উপর বোমা বর্ষণে মুহূর্তে ভগ্নস্তূপে পরিণত করে সবকিছু, কেড়ে নেয় অজস্র প্রাণ; ঘৃণা ও ধিক্কারে চড়ুই পাখি ডেকে যায়, ছিঃ ছিঃ ছিঃ। লেখকের ভাষায় –

> নিঃসঙ্গ এক চড়ুই পাখিকে প্রায়ই দেখা যায় জানালার ধারে, রেলিং-এর উপর। ঘৃণার স্বরে সে ডেকে যায়, ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ ।
>
> এ ছিঃ ছিঃ ছিঃ কিসের জন্য? এ ধিক্কার কাদের জন্যে?
>
> এ নিশ্চয় তাদের জন্যে যারা ডিম্ববতী মহাপতঙ্গিনীর পেটে চড়ে উড়ে বেড়ায় আর অশান্তি ডেকে আনে।[৩৭]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নয় লেখকের মূল লক্ষ্য এর ব্যবহারকারীরা। তাইতো লেখক চড়ুই পাখির জবানিতে উচ্চারণ করেন –

> পুরুষ চড়ুই বলে, দো-পেয়ে দৈত্য সমস্ত দুঃখ-অশান্তি দূর করতে পারে। ওরা ইচ্ছে করলে আরও সুন্দর করতে পারে পৃথিবীকে।[৩৮]

মানুষ যে চাইলেই পৃথিবীকে সুখের আবাস করে গড়ে তুলতে পারে – এ প্রত্যয়ই ব্যক্ত হয়েছে আলোচ্য গল্পে। লেখক বিজ্ঞানের নয়, মানুষের সৃষ্টি ও ধ্বংসের যুগপৎ ছবি অঙ্কন করেছেন – তাদের কর্মকাণ্ড যে কখনও কখনও তুচ্ছ চড়ুই পাখির কাছেও ঘৃণ্য হতে পারে এ বার্তার মাধ্যমে সচেতন করতে চেয়েছেন মানুষকে এবং লেখকের সে প্রচেষ্টা সর্বাঙ্গীণ সাফল্য পেয়েছে এ শিল্প মাধ্যমে।

'মহাপতঙ্গ' গল্পগ্রন্থে লেখক বহুবর্ণিল বিষয়াবলিকে ধারণ করেছেন, রূপকায়িত করেছেন সত্য – তবে প্রতিটি গল্পের অন্তিমে কল্যাণকামিতা, মানুষের শুভবোধের উদয় এবং মানবতার অবমাননার প্রতি শ্লেষ প্রকাশিত হয়েছে। নানা ত্রুটি নানা অসঙ্গতি বিসঙ্গতি সবকিছু ছাপিয়ে লেখক যে জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

ইতিবাচকতাতেই বিশ্বাস রেখেছেন,রূপায়ণ করেছেন কুশলী দক্ষতায় – সচেতন পাঠকের দৃষ্টিতে তা এড়ায় না। আর লেখকের এ প্রচেষ্টাই জীবনবোধের ইতিবাচকতায় সাফল্যমণ্ডিত করেছে এ গল্পগ্রন্থটিকে।

চরিত্র-নির্মাণেও পূর্বের গল্পগ্রন্থের তুলনায় এ গ্রন্থে লেখক সফলতা লাভ করেছেন। বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম শক্তিশালী ও প্রতিবাদী চরিত্র-ওসমান ('জোঁক') সামন্ত-প্রভুদের শোষণের প্রতিরোধে যে সংগ্রামী প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে তা যুগের চাইতেও সাহসিকতার পরিচায়ক। কৃষিপ্রধান বাংলার সরল প্রতিবাদী কৃষকের প্রতীক ওসমান। এ চরিত্রটি বহুকাল বেঁচে থাকবে পাঠকের মনে,সহজেই হারিয়ে যাবে না।

ওসমানের মতোই আরেক প্রতিবাদী চরিত্র ইয়াসিন ('বিস্ফোরণ'); যদিও তার প্রতিবাদ ভাষা পেয়েছে গল্পের শেষাংশে। নিজ স্ত্রীর সম্মান বাঁচাতে সে তার পুরোনো মনিব এবং প্রবল ক্ষমতাধর আতাউল্লাহ্ খাঁ-কে দৈহিকভাবে আক্রমণ করতেও দ্বিধা করে নি।

চিরন্তন তরুণ-তরুণীর প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় ইউনুস ও নূরজাহান ('আবর্ত') চরিত্রে। 'খুতি' গল্পের আকবর সাহেব নেতিবাচক হলেও অত্যন্ত বাস্তব। ধর্ম দিয়ে নয়, মানুষের বিচার করতে হবে নৈতিকতা দিয়ে – এ ব্যাপারটি পরিস্ফুট হয়েছে আকবর সাহেবের চরিত্রে। রুস্তম ('উত্তরণ') চরিত্রের মাধ্যমে লেখক চরিত্রের বিকাশকে ধারণ করেছেন। নূর-মোহাম্মদ ('প্রতিবিম্ব') নিম্নবিত্তের কেরানী শ্রেণীর প্রতিনিধি – কেরানী জীবনের গভীর দুর্দশা এ চরিত্রের আশ্রয়ে রূপ লাভ করেছে। বস্তুত ছোটগল্পের সীমিত পরিধিতেও এ গল্পগুলোর চরিত্র সজীব ও প্রাণবন্ত – অনেকক্ষেত্রে পুরোপুরি রক্ত-মাংসের মানুষ। এ গল্পগুলোর চরিত্র-রূপায়ণে লেখকের সফলতা প্রশ্নাতীত।

পূর্বের গল্পগুলোর মতো এ গ্রন্থের গল্পগুলোতেও লেখক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ এবং বর্ণনাধর্মী-রীতি গ্রহণ করেছেন। রূপকের আবহে চমৎকার দুটি গল্প রচিত হয়েছে এ গ্রন্থে। ভাষারীতি অনুসরণে লেখক বরাবরই চলিত ও আঞ্চলিক ভাষা-বৈশিষ্ট্যের অনুরাগী ;এ গ্রন্থেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতার নির্মাণে লেখক অলঙ্কারবর্জিত যে ভাষা নির্মাণ করেছেন তা বিষয়ের গুণেই হয়ে ওঠেছে সরল ও ঋজু। প্রকৃতির পরিচর্যাও খুব একটা নেই এ গ্রন্থে। তথাপি বাস্তবতার নির্মাণে, রূপকধর্মিতায় এবং জীবনদর্শনের যথার্থ প্রতিফলনে এ গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্মৃতিবিচিত্রা

'স্মৃতিবিচিত্রা' (২০০১) যথার্থ বিচারে পূর্ণাঙ্গ গল্পগ্রন্থ নয়। তবে গল্পকারেই আবু ইসহাকের অমূল্য স্মৃতিসম্ভার রক্ষিত হয়েছে। প্রচলিত স্মৃতিচারণ নয়, 'ইলিয়াস' নামক এক চরিত্রের মাধ্যমে ২৪টি স্মৃতিকথা গল্পাকারে উপস্থাপিত হয়েছে এ গ্রন্থে। 'ইলিয়াস' যে কল্পিত কোনো চরিত্র নয়, এ যে লেখক নিজেই – পাঠক তা সহজেই ধরতে পারে, তবুও নামের এ আড়ালটুকু এক ধরনের গাল্পিক রস ঘনীভূত করতে সহায়তা করে। 'অপরিশোধ্য ঋণ', 'গাড়ল', 'কাগুজে বাঘ', 'মৌমাছি', রহস্যভেদ' প্রভৃতি রচনায় লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বেড়ে ওঠার ইতিবৃত্ত এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। লেখক আবু ইসহাককে জানার জন্য গ্রন্থটি অপরিহার্য।

এ গ্রন্থে সংকলিত 'অভিশাপ' লেখকের প্রথম মুদ্রিত গল্প। সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সালে রচিত এ গল্পটি কবি নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকার রবিবাসরীয় জলসায়, ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়, লেখক তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। প্রথম গল্পে লেখক যে-গল্পকৌশল অবলম্বন করেছেন, পরিণত বয়সেও তাঁর রচনায় একই কৌশলের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্নে সারা বিশ্বজুড়ে জাতি বিদ্বেষ ও হানাহানি যে বিভীষিকার রূপ পরিগ্রহ করে,লেখক তাঁর রচনায় তা মাকড়সা, মাছি, টিকটিকি, পিঁপড়ের রূপকাকারে বিবৃত করেছেন। জীবজগতের খাদ্য-শৃঙ্খলে দুর্বল প্রাণী অপেক্ষাকৃত সবল প্রাণীর আহার্য বলে বিবেচিত। প্রাকৃতিক নিয়মেই মাকড়সা তাড়া করে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে চায় মাছিকে, মাকড়সা আবার আক্রান্ত হয় টিকটিকির দ্বারা, অন্যদিকে আহত মাছিটিকে খাবার হিসেবে গ্রহণের জন্য লালপিঁপড়ে ও কালো পিঁপড়ের দুই দলের মারামারি শুরু হয়। এই অবপ্রাণীদের হানাহানির মধ্যে লেখক যেন প্রত্যক্ষ করেন মানবজাতির দ্বন্দ্ব – মূলত ইতর প্রাণীরা প্রাণধারণের লক্ষ্যে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে দুর্বল প্রাণীর উপর হামলা চালায় আর সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ স্রেফ ক্ষমতার লোভে বিশ্বজুড়ে চালায় নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ, বিষয়টিকে লেখক চমৎকার স্বভাবসুলভ তীর্যকতায় প্রকাশ করেছেন এভাবে –

> একি ! জার্মানি ও পোল্যান্ডের লড়াই – যা এতক্ষণ কাগজে দেখছিলাম, তার রূপ যে এখানে এ খুদে জীবদের মাঝেও তার বিভীষিকা নিয়ে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। যে ভয়ঙ্কর

Dhaka University Institutional Repository

> মারামারি-খুনোখুনি দেখলাম ইতর প্রাণীদের মাঝে, মানুষের মাঝেও তো তার কোনো ব্যত্যয় দেখছিনা। এই রক্তক্ষয়ী সর্ববিধ্বংসী যুদ্ধের অভিশাপ থেকে মানুষ কবে মুক্ত হবে? [৩৯]

যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন লেখক তাঁর রচনার শেষাংশে সে-প্রশ্ন আজ বিশ্বের সকল শান্তিকামী মানুষের অন্তরের। শান্তির পক্ষে, যুদ্ধের বিপক্ষে আজকের বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অবস্থান।

'অভিশাপ' ব্যতীত এ গ্রন্থের অন্যসব রচনাই লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ। তন্মধ্যে ঊনমূল্যায়ন, প্রতারক, জনসেবক, অভিযান প্রভৃতি রচনায় লেখকের চাকুরি-জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নাটকীয় ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। 'ইলিয়াস' নামক চরিত্রের আড়ালে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ব্যক্ত করেছেন স্পষ্টভাবে –

> সুনীতিকে তালাক দিয়ে দুর্নীতির সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে তিনি রাজি হন নি কোনো দিন। [৪০]

লেখক নিজেই ইলিয়াস – এই জীবনদর্শনও তাঁরই। পুলিশে চাকরি করেও তিনি আজীবন সততা রক্ষা করেছেন – যা তাঁর পেশার সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তবুও তিনি এ পেশাকে জনসেবায় রূপান্তরিত করেছিলেন সততা, নিষ্ঠা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বিবেচনায়।

আবু ইসহাক তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্নতার মূল উৎপাটনে সচেষ্ট ছিলেন, 'গনৎকার', ' না-জায়িজ সওয়াল' এবং 'আগুনমুখো ভূত' প্রভৃতি রচনাতেও সে প্রচেষ্টা দেখা যায়। 'আগুনমুখো ভূত' রচনায় তিনি ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে এ সত্যই প্রতিষ্ঠিত যে – ভূত আসলে দুষ্ট লোকের কারসাজি ছাড়া অন্য কিছু নয়। মানুষের অন্তর্গত ভীতিকে আশ্রয় করে কিছু সুযোগসন্ধানী দুষ্ট লোকই অতিপ্রাকৃত আবহ সৃষ্টি করে ভূতের ভয় দেখায় – বাস্তবে 'ভূত' বলে কিছু নেই।

এ গ্রন্থের রচনাগুলো ছোটগল্পের কাঠামো এবং নাটকীয় ভঙ্গি গ্রহণ করলেও সার্থক ছোটগল্প হয়ে ওঠেনি। লেখকের প্রথম গল্প 'অভিশাপ' সম্পর্কে আলোচনার জন্যই গ্রন্থটিকে আমরা বিবেচনার অন্তর্গত করেছি। লেখকের প্রথম গল্পের আলোচনা অনিবার্য ছিল কেননা গল্পকারের ক্রমবিকাশ অনুসন্ধানে এর গুরুত্ব যথেষ্ট। সার্বিক বিচারে বলা যায় যে, গল্পকার হিসেবে আবু ইসহাক প্রথম থেকেই রূপকাশ্রয়ী। তবে তাঁর রচনার সৌকর্য কালের প্রবাহে অধিকতর পরিণত হয়ে উঠেছিল;

Dhaka University Institutional Repository

'হারেম' ও 'মহাপতঙ্গ' গল্পগ্রন্থ দু'টির আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়েছে। স্বল্প-সংখ্যক ছোটগল্পের রচয়িতা হলেও আবু ইসহাকের কিছু কিছু গল্পের উৎকর্ষ তাঁকে প্রাতিস্বিক গল্পকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। জীবনের বাস্তব রূপায়ণে আবু ইসহাক গল্পকার হিসেবেও শিল্প-সফলতা অর্জন করেছেন।

তথ্যনির্দেশ :

১. Karl Beckson & Arthur, *A Reader's Guide to Literary Terms* (New York, 1960) , Page-193

২.নাসির আলী মামুনকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার,শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী,প্রথম আলো,১৬ নভেম্বর,২০০১

৩. আবু ইসহাক, *হারেম* (ঢাকা : মুক্তধারা , কার্তিক ১৩৯৪) ,পৃ. ১২
এখন থেকে উদ্ধৃতির জন্যে গ্রন্থের উক্ত সংস্করণ দ্রষ্টব্য

৪. *হারেম*, পৃ. ১০৭

৫. *হারেম*, পৃ.২৪-২৫

৬. *হারেম*, পৃ.৮৯-৯০

৭. *হারেম*, পৃ.৮৫

৮. *হারেম*, পৃ.৫৭

৯. *হারেম*, পৃ.৫৬

১০. সরওয়ার মুর্শেদ, *আবু ইসহাকের একুশের গল্প*, সংবাদ সাময়িকী, ১৭ মার্চ, ২০০৫

১১. *হারেম*, পৃ.৩০

১২. *হারেম*, পৃ.৩০

১৩. *হারেম*, পৃ.৩২

১৪. *হারেম*, পৃ.৩৩

১৫. *হারেম*, পৃ.৩৩

১৬. *হারেম*, পৃ.৪২

১৭. *হারেম*, পৃ.৭৪

১৮. *হারেম*, পৃ. ৮৩

১৯. *হারেম*, পৃ.৭৬

২০. *হারেম*, পৃ.৮৩

২১. *হারেম*, পৃ.৯১

২২. আবু ইসহাক, *মহাপতঙ্গ* (ঢাকা : মুক্তধারা , অগাস্ট ১৯৮৪) ,পৃ. ৯
এখন থেকে উদ্ধৃতির জন্যে গ্রন্থের উক্ত সংস্করণ দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

২৩. *মহাপতঙ্গ*,পৃ. ১৬

২৪. *মহাপতঙ্গ*,পৃ. ১৮

২৫. *মহাপতঙ্গ*,পৃ. ১৯

২৬. *মহাপতঙ্গ*,পৃ. ২৪

২৭. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প: বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য* (ঢাকা: বাংল একাডেমী, এপ্রিল ১৯৯৬), পৃ. ১৯৩

২৮. *মহাপতঙ্গ*,পৃ. ৪৩

২৯. মহাপতঙ্গ,পৃ. ২৮-২৯

৩০. *মহাপতঙ্গ*,পৃ. ২৭

৩১. নাসির আলী মামুনকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার,শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী,প্রথম আলো,১৬ নভেম্বর,২০০১

৩২. আবু ইসহাক, *স্মৃতিবিচিত্রা* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, বইমেলা ২০০১), পৃ. ১২২

এখন থেকে উদ্ধৃতির জন্যে গ্রন্থের উক্ত সংস্করণ দ্রষ্টব্য

৩৩. *মহাপতঙ্গ*,পৃ. ১২১

৩৪. *মহাপতঙ্গ*,পৃ. ১০১

৩৫. *মহাপতঙ্গ*,পৃ. ৮১

৩৬. *মহাপতঙ্গ*,পৃ. ৮৯

৩৭. *মহাপতঙ্গ*,পৃ. ১৩১

৩৮. *মহাপতঙ্গ*,পৃ. ১২৭

৩৯. *স্মৃতিবিচিত্রা* পৃ. ১৫

৪০. *স্মৃতিবিচিত্রা* পৃ. ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

১৯৪৭-এর পরবর্তী বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারা মুখ্যত গ্রাম-কেন্দ্রিক। প্রায় দুইশ' বছর ইংরেজ শাসনাধীন থাকলেও পূর্ব বাংলার মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ বা ইউরোপীয় ভাবধারায় স্নাত হয়ে ক্রমশ নাগরিক হয়ে ওঠেনি। এ কারণে বৃহত্তর গ্রামীণ পরিবেশ এবং এ পরিবেশে ক্ষুধা-দারিদ্র্য-শোষণ-বৈষম্য প্রভৃতি প্রতিকূলতার সহযাত্রী হয়ে নিম্নবর্গীয় মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামই বাংলাদেশের অধিকাংশ উপন্যাসের মূল উপজীব্য।

নাগরিক যুগ-যন্ত্রণা, একাকিত্ব বা হতাশা নয় – গ্রাম সমাজে শোষক ও শোষিতের অবস্থান, নানা কুসংস্কার, ধর্মীয় প্রভাব কিংবা চিরায়ত গ্রামীণ সমাজে নারীর অবস্থান প্রভৃতির শিল্প-সত্য রচনাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ থেকে শুরু করে আবু ইসহাক পর্যন্ত বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের বিষয় হয়ে এসেছে।

পূর্ববর্তীদের ধারা অনুসরণ করে আবু ইসহাকও গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন বাস্তবতা, নানা অনাচার, বৈষম্যের ছবি এঁকেছেন তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে। তবে যেহেতু শিল্পী মাত্রই স্বতন্ত্র, সেহেতু প্রচলিত ধারার অনুসরণেও তাঁর কথাসাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য সমুজ্জ্বল। একজন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অসহায় নারীর উন্মুলিত জীবন-সংগ্রামকে রূপায়িত করতে গিয়ে তিনি চিরায়ত গ্রাম-বাংলার রূপ ধারণ করেছেন একটিমাত্র উপন্যাসে। আবার কখনও কেবল একটি বিশেষ অঞ্চলের জীবন-বর্ণনা করেছেন পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে। অন্যদিকে আরব্য-রজনীর কাহিনী পরিপাট্য বা 'স্টোরিটাইপ' ব্যবহার করে লেখক একনায়কতন্ত্রের গল্প বলেছেন রূপকাঙ্গিকে। সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্নতার খোলস ছাড়িয়ে নিরেট বাস্তবতা বা কিছু ধূর্ত মানুষের কারসাজিকে আবু ইসহাক পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন গল্প ও উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিকে।

কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাক তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী সমাজ ও মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেছেন গভীর অনুসন্ধিৎসা ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিতে। পূর্ব বাংলার মানুষ যখন দুর্ভিক্ষের তাড়নায়, ধর্মের-প্রাবল্যে এবং অশিক্ষার অন্ধকারে অমানবিক জীবনযাপনরত, তখন সংকীর্ণতা-বিরোধী ও উদার মানবতাবাদী

Dhaka University Institutional Repository

আবু ইসহাক তাঁর কথাসাহিত্যের মাধ্যমে দূর করার চেষ্টা করেছেন সকল তমসা। বিষয়স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পবৈশিষ্ট্যের বিচারে বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক. আলোচিত মূলগ্রন্থ

আবু ইসহাক : *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, অষ্টাদশ সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৬, বাংলা-১৪১২।

: *পদ্মার পলিদ্বীপ*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর-২০০০।

: *জাল*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ৮ ফাল্গুন ১৩৯৫, ২১ ফেব্রুয়ারি-১৯৮৯।

: *হারেম*, মুক্তধারা, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ, কার্তিক-১৩৯৪।

: *মহাপতঙ্গ*, মুক্তধারা, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, আগষ্ট-১৯৮৪।

: *স্মৃতিবিচিত্রা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা-২০০১।

খ. সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

অশ্রু কুমার সিকদার : *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, অরুনা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : *রচনাসমগ্র-৩*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন-১৪১০, মার্চ-২০০৪।

আজহার ইসলাম : *বাংলাদেশের ছোটগল্প: বিষয়ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৯৭)

কামরুদ্দীন আহ্‌মদ : *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি* (ঢাকা: ইনসাইড লাইবেরী, ১৯৮৩)

খালেদা হানুম : *বাংলাদেশের ছোটগল্প* (ঢাকা: এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ১৯৯৭)

গিয়াস শামীম : *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ২০০২)

Dhaka University Institutional Repository

তপোধীর ভট্টাচার্য : *উপন্যাসের প্রতিবেদন* (কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৯)

দেবেশ রায় : *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, জানুয়ারি-১৯৯১।

: *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি-১৯৯৪।

পিটার কাস্টার্স : *তেভাগা অভ্যুত্থানে নারী* (অনুবাদ-কৃষ্ণা নিয়োগী) গণ সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১ মে, ১৯৯২।

ফরিদা সুলতানা : *বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবনচেতনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯)

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বাংলাদেশের সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১)

ভূঁইয়া ইকবাল : *বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র (১৯৪৭-১৯৭১)* (ঢকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১)

মহীবুল আজিজ : *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০২)

মুহম্মদ ইদরিস আলী : *বাংলাদেশের উপন্যসসাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)

: আমাদের *উপন্যাস বিষয়-চেতনা: বিভাগোত্তর কাল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮)

মুহম্মদ রেজাউল হক : *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস (১৯৪৫-১৯৬০)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯)

মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন : *বাংলাদেশের ছোটগল্প: জীবন ও সমাজ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)

রণেশ দাশগুপ্ত : *উপন্যাসের শিল্পরূপ* (ঢাকা: কালিকলম প্রকাশনী, ১৯৭৩)

রফিকউল্লাহ খান : *উপন্যাসের শিল্পরূপ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)

: *শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০)

Dhaka University Institutional Repository

শাহীদা আখতার : *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২)

শিরীণ আখতার : *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* (কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা .লি. ১৩৮০)

শ্রীশচন্দ্র দাশ : *সাহিত্য-সন্দর্শন* (ঢাকা: বর্ণবিচিত্রা, ১৯৯৫)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (কলকাতা :সাহিত্যশ্রী,১৯৭৬)

সৈয়দ আকরম হোসেন : বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)

: প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৭)

হাসান আজিজুল হক : *কথাসাহিত্যের কথকতা,* সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪।

গ.সহায়ক প্রবন্ধ

শহীদ ইকবাল : পদ্মার পলিদ্বীপঃ বিষয় ও বিন্যাসে, উলুখাগড়া, ঢাকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বর্ষা, ১৪১২, আগষ্ট-২০০৫।

মহীবুল আজিজ :ভাটি অঞ্চলের অস্তিত্বের সংগ্রাম ও সমুদ্রবাসর, উলুখাগড়া, ঢাকা, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, বর্ষা, ১৪১২, আগষ্ট-২০০৫।

স্বরোচিষ সরকার : আবু ইসহাক, জয়যুক্তেষু, সংবাদ সাময়িকী, ২৭ ফেব্রুয়ারী-২০০৩।

মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন : আবু ইসহাকের সাহিত্যভুবন, ২৭ ফেব্রুয়ারি-২০০৩।

সরওয়ার মুর্শেদ : আবু ইসহাকের একুশের গল্প, সংবাদ সাময়িকী, ১৭ মার্চ, ২০০৫।

নাসির আলী মামুন : আবু ইসহাককে দেখা, শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী, প্রথম আলো, ১৪ মার্চ-২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Bernard Bergonzi, *The Situation of the Novel* (London and Basingstake, The Macmillan Press Ltd., Second Edition, 1979).

D.H. Lawrence, *Selected literary Criticism* (London, 1961).

Karl Beckson and Arthur, *A Reader's Guide to literary terms* (New York ,The Noonday Press, 1960)

M. H. Abrams, *A Glossary of Literary Terms* (USA: Cornel University 1981)

Northorp Frye, *Anatomy of Criticism* (New Jersey, Princeton University Press, Third Printing 1973)

Sigmund Frued, *Totem and Taboo*, (Tr: James Strachy)(London, Routladge & Kegan Paul, 1950)

Stephen Spender, *The Struggle of the Modern*, 1963

William Flint Thrall & Addison Hibbard, *A Handbook of Literature* (New York, USA: The Odyssey Press, 1962)

ঙ) সাক্ষাৎকার

আমার লেখালেখি প্রসঙ্গ, কথাশিল্পী আবু ইসহাকের সাক্ষাৎকার।

সাক্ষাৎকার গ্রহণঃ আমিনুর রহমান সুলতান, সংবাদ সাময়িকী, ১৯ সেপ্টেম্বর-২০০২।

'সমসাময়িক লেখকদের চেয়ে আলাদা থাকতে চেয়েছি'- আবু ইসহাক,

সাক্ষাৎকার গ্রহণঃ নাসির আলী মামুন, শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী, প্রথম আলো, ১৬ নভেম্বর-২০০১।

Dhaka University Institutional Repository